বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

প্রথম বর্ষ ■ সংখ্যা - ৪ ■ নভেম্বর ২০১১

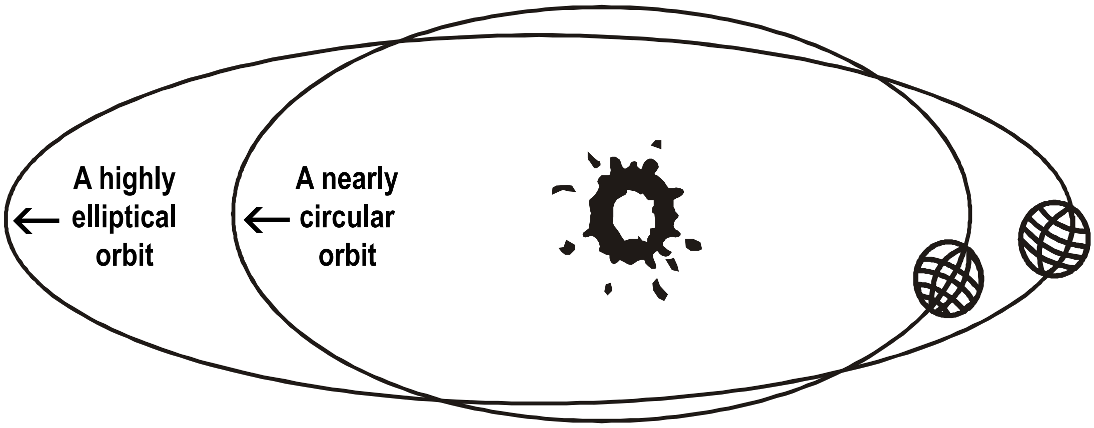

গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি ?

- ■ শিশু-শ্রম ও শিশু-শ্রমিক কেন ?
- ■ মানুষের বংশগত রোগ, প্রতিকার ও চিকিৎসা
- ■ ধারাবাহিক রচনা ঃ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান
- ■ গল্প ঃ রামধনুর খোঁজে

"সবই ব্যাদে আছে"
মেঘনাদ সাহা

আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১ কোন দৃষ্টিতে পালন করা উচিত

■ রিপোর্ট ■ সংগঠন সংবাদ ■ পাঠকের কলম ■ কবিতা

সম্পাদকীয়

সমীক্ষণ-এর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু অভিমত জানানো দরকার। প্রথমেই বলে রাখা দরকার মুদ্রণ প্রমাদ বিষয়ে। এই ব্যাপারে পত্রিকাকে আরও যত্নশীল হবার দরকার রয়েছে। এই সমস্যাটি আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলাম কিন্তু তৃতীয় সংখ্যায় তা পুনরায় ফিরে এসেছে এবং পাঠকরা তা সঠিকভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ব্যাপারে পত্রিকা আরও যত্নবান হবে।

"পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান" – এটাই ছিল গত সংখ্যার প্রধান বিষয়। এই বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া পত্রিকার কাছে এসেছে। সাধারণ প্রতিক্রিয়া হ'ল – রচনাটি মৌলিক এবং আরও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই চাহিদার সাথে পত্রিকা একমত। পত্রিকা মনে করে বর্তমান সময়ে পরিবেশ হ'ল সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এবং এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পত্রিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী সংখ্যাগুলিতে পরিবেশ নিয়ে নিয়মিত রচনা থাকবে। ঐ রচনার অন্য প্রতিক্রিয়াটি রচনাটির মূল সিদ্ধান্তের পরিপন্থী অর্থাৎ বিশ্বউষ্ণায়ন ও পরিবেশ বিপন্নতার জন্য গোটা মনুষ্য সমাজটাই দায়ী। অর্থাৎ, একজন শ্রমিক যিনি কারখানায় কাজ করে পরিবারের পেট চালান, তিনি যেমন দায়ী আবার ঐ কারখানার মালিকও সমান দায়ী। 'সমীক্ষণ' প্রতিটি ঘটনাকে তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে যদি তা গঠনমূলক হয়, যদি তা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে হয়। পাঠক বন্ধুদের কাছে আহ্বান - ভিন্ন মত বলিষ্ঠভাবে জানান, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব।

গত সংখ্যার সম্পাদকীয় (২)তে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটলে তা মনুষ্য কার্যকলাপ জনিত বলা হচ্ছে কিন্তু গড় তাপমাত্রা হ্রাস ঘটলে (১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা হ্রাস পায়) তার জন্য অন্য যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে'। পাঠকদের প্রশ্ন 'অন্য যুক্তি' বলতে কোন যুক্তির কথা বলা হয়েছে ? উত্তরে বলা যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে যে গড় তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছিল তার যুক্তি হিসাবে বলা হয় সমুদ্রের জলের তাপ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু সঠিক কারণ তা নয়। সঠিক কারণের জন্য এই সংখ্যার "বিশ্ব উষ্ণায়ন কি মানুষের সৃষ্টি ?" রচনার 'তুষার যুগ' রচনাংশ দ্রষ্টব্য।

কিছু পাঠকের জিজ্ঞাসা – পরিবেশ সৃষ্টির সময় বায়ুমন্ডলে মুক্ত আক্সিজেন ছিল না; তা হলে তাপদায়ী বিক্রিয়া কিভাবে হ'ত ? এই প্রশ্নের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যা হ'ল – তাপদায়ী বিক্রিয়া কেবলমাত্র আক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অর্থাৎ জারণ তথা দহনের ফলেই ঘটে থাকে। এটা সর্বদা সত্য নয়। পরিবেশ সৃষ্টির সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া নয় বরং নিউক্লিয় বিক্রিয়াই ছিল তাপ সৃষ্টির প্রধান কারণ। সূর্যে যে সমস্ত বিক্রিয়া ঘটছে তা সবই নিউক্লিয় বিক্রিয়া - বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যা প্রমাণিত। আবার সকল দহন বিক্রিয়াই যে তাপদায়ী তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেনের দহনে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন একটি তাপশোষী বিক্রিয়া।

পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় কিছু কিছু বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহারের দাবী এসেছে বিভিন্ন পাঠকের কাছ থেকে। পত্রিকা এই পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করছে।

সর্বশেষে, পত্রিকার পাঠক শ্রীযুক্ত জন হায়দার মহাশয় 'সমীক্ষণ'-এর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে একটি চিঠি পত্রিকায় পাঠিয়েছেন যা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। উক্ত চিঠিতে জন হায়দার মহাশয় একটি প্রশ্ন উথাপন করেছেন যা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। "অতঃপর আপনাদিগের পত্রিকায় প্রকাশিত (সমীক্ষণ-প্রথম বর্ষ-সংখ্যা ৩) "শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে "ভূমিকার বদলে" উপশিরোনামে রচনাটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত রচনায় আপনারা ঘোষণা করিয়াছেন "শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান ক্ষমতাসীন শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় - সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। শ্রেণী বিভক্ত শ্রেণীহীন সামাজিক চাহিদার স্বরূপটি কি ? যে স্থলে শ্রেণীহীন সমাজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই সে স্থলে শতধা বিদীর্ণ ও বিভক্ত সমাজে অন্য কোন্ অখন্ড সামাজিক পটপ্রেক্ষার হদিশ নিবন্ধকার পাইয়াছেন তাহা আমি জানিতে আগ্রহী।" শ্রীযুক্ত জন হায়দার মহাশয়কে জানাই রচনাটি ধারাবাহিক, আগামী সংখ্যাগুলির মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পাবেন, এই আশা রাখি। ■

গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি ?

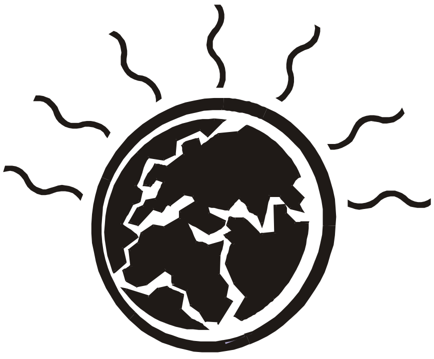

বর্তমানে, “গ্লোবাল ওয়ার্মিং” শব্দটির সঙ্গে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরিচিত। বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালকরা এই বিষয়টিকে বিশ্বের ‘জ্বলন্ত সমস্যা’ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। IPCC (Inter Governmental Panel For Climate Change)-এর এক সময়ের সভাপতি, রাজেন্দ্র পাচৌরির বক্তব্য, - বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য, ভারতের হিমালয়ের হিমবাহগুলি ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে শেষ হয়ে যাবে। IPCC-এর রিপোর্টে বলা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য বাংলাদেশের ২০% অঞ্চল জলের তলায় ডুবে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার মোহনায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত “ঘোড়ামারা” দ্বীপের অবস্থানকে দেখিয়ে, বিশ্ব উষ্ণায়ণের তথ্যচিত্র বানিয়েছে একটি NGO। আর এই জ্বলন্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করতে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত “পরিবেশ বিদ্যা” নামক বিষয় আবশ্যকীয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যসূচীর মূল বক্তব্য হল – বনভূমি হ্রাস, কারখানা স্থাপন, ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রিক অক্সাইড (NO), ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) প্রভৃতি গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই গ্যাসগুলির “গ্রীন হাউস এফেক্ট” আছে এবং এদের তাপ-ধারণ ক্ষমতা বেশি। ফলে পরিবেশে এই গ্যাসগুলি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ের মাথায় জমা বরফ ও হিমবাহগুলি গলে যাবে, ফলে নদীতে প্রথমে জলতল বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত নদীগুলি শুকিয়ে যাবে। সমুদ্রতল বৃদ্ধি পাবে – যার জন্য উপকূলবর্তী নীচু অঞ্চলগুলি সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। বহু মানুষ ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবেশবাদী ও এনজিও-দের মতে প্রকৃতি নির্ভর মানবজীবনকে অগ্রাহ্য করাই - “গ্লোবাল ওয়ার্মিং”-এর মূল কারণ।

কিন্তু, রাজেন্দ্র পাচৌরির বক্তব্যের ভিত্তি হল, একটি এনজিও দ্বারা প্রকাশিত, “New Scientist” পত্রিকা – যেখানে এই বক্তব্য সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। হিমালয়ের ৯ হাজারেরও বেশি হিমবাহের গলন নিয়ে গবেষণা খুবই কম হয়েছে। হিমবাহগুলির গলন হচ্ছে বলেই ঐ হিমবাহগুলি থেকে সৃষ্ট নদীগুলিতে জল পাওয়া যায়। কিন্তু হিমবাহগুলির গলন অস্বাভাবিক কিনা – তা এখনো স্বীকৃত নয়।

বাংলাদেশের সরকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে, পলি পড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ২৩ বর্গ কিমি জমি বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়ামারা দ্বীপ-এর ঠিক পাশেই অবস্থিত নয়াচর দ্বীপ গত এক দশকে বেড়ে গেছে অনেকটা। আবার ১৯৪০-১৯৭০ পর্যন্ত শীতলায়ন বা গ্লোবাল কুলিং (তাপমাত্রা হ্রাস) এবং গত বছরে ইউরোপে অস্বাভাবিক তুষারপাত, আমাদের একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ সবের কারণ কী ?

এবিষয়ে জানতে গেলে, যেগুলি জানা দরকার সেগুলি হল–

- **পৃথিবীর তাপচক্রে, তাপের উৎস কী ?**
- **তাপের উৎস এবং তা থেকে কিভাবে ও কতটা তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায় ?**
- **তাপের উৎস সূর্য ও তাপগ্রাহক পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন**
- **গ্রীন হাউস এফেক্ট**

আজ থেকে আনুমানিক ৪৫৬ কোটি বছর আগে সোলার নেবুলা থেকে সৃষ্ট পৃথিবী ছিল একটি বন্ধ্যা গ্রহ (Barren planet)। প্রাথমিকভাবে হেডিয়ান যুগে, সৃষ্টির পর যত সময়

গেছে, পৃথিবী তত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে – প্রধানত তিনটি উপায়ে

(১) আদি অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি দৃঢ়ভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে, তাদের মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

(২) ইউরেনিয়াম (U), থোরিয়াম (Th), পটাশিয়াম (K_{40}) রুবিডিয়াম (Rb), -এর মত তেজস্ক্রীয় মৌলগুলির, তেজস্ক্রীয় বিঘটনের ফলে উৎপন্ন তাপ দ্বারা (যা ছিল ঐ সময়ের পৃথিবীতে তাপের প্রধান উৎস)।

(৩) উল্কাপাতের মত ঘটনা পৃথিবীর উপরিতলকে উত্তপ্ত করেছে।

নব্যজাত পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধিই ছিল তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমনকি পৃথিবীর তাপমাত্রা একসময় লোহার গলনাঙ্কে পৌঁছে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান মৌলগুলি তাদের ভর, আপেক্ষিক গুরুত্ব, রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত হয়েছে। যেমন লোহা, নিকেলের মত ভারী ধাতুগুলি পৃথিবীর কেন্দ্র বা কোরে(Core) জমা হয়েছে এবং অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম-এর মত হাল্কা মৌলগুলি পৃথিবীর crust ও mantle-এ জমা হয়েছে। কিন্তু ইউরেনিয়াম (U), থোরিয়াম (Th) এর মত ভারী মৌলগুলি তাদের আয়নের আকার ও রাসায়নিক আসক্তির জন্য অক্সিজেন (O_2) ও সিলিকনের (Si) খনিজের সঙ্গে যৌগ গঠন করে crust ও mantle এ জমা হয়েছে। [চিত্র ঃ ১] এই চিত্রে সময়ের সাথে সাথে তেজস্ক্রীয় বিকিরণজনিত তাপের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

যেহেতু তেজস্ক্রীয় মৌলগুলির বিকিরণ সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায়, তাই পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রাও হ্রাস পায়। যখন crust যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা হল, যাতে পুনরায় গলে না যায়, তখনই সম্ভবত, নীচের উত্তপ্ত গলিত তরলের পরিচলন স্রোতের জন্য লিথস্ফিয়ারিক প্লেটের সঞ্চালন শুরু হয়। ক্রমশ পৃথিবীর তেজস্ক্রীয় মৌলের বিকিরণের হারহ্রাস পেয়ে এমন একটা অবস্থায় দাঁড়ায় যে পৃথিবীর উপরিতল (Crust) ও বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা সৌরশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময় থেকে পৃথিবী নিজে আর তাপের উৎসরূপে কাজ করেনি। এই কারণেই প্রোটোরোজোয়িক যুগের (২৫০-৫.৭ কোটি বছর) আগে কোন তুষার যুগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই সময় থেকেই পৃথিবীর তাপচক্রে, তাপের প্রধান উৎস হল সূর্য।

সূর্য ও সৌরকলঙ্ক

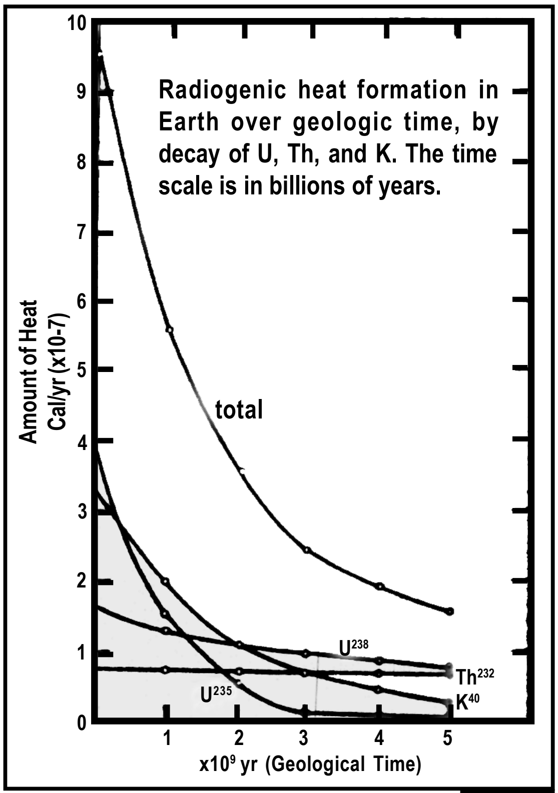

চিত্র ঃ ১

সূর্য প্রকৃতপক্ষে একটি গ্যাসীয় মিশ্র হওয়ায়, এর কোন সুনির্দিষ্ট মাপের পৃষ্ঠতল নেই। বাইরের দিক দিয়ে

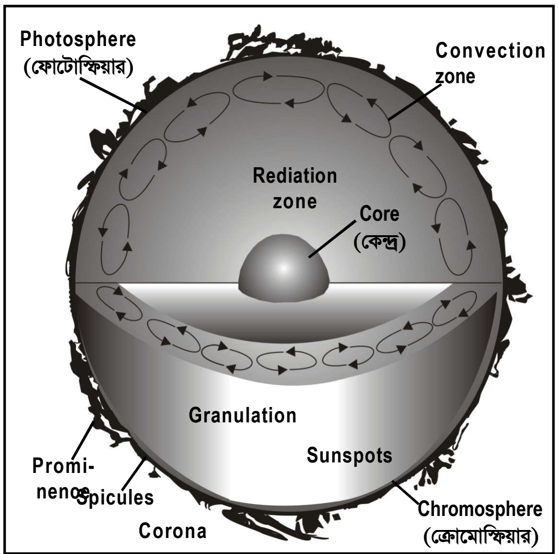

চিত্র ঃ ২

ফোটোস্ফিয়ার (Photo sphere), ক্রোমোস্ফিয়ার (Chromo Sphere), কোর (Core) নিয়ে গঠিত। [চিত্র ঃ ২]

(ক) **ফোটোস্ফিয়ার**

এটি সূর্যের সবচেয়ে বাইরের দৃশ্যত উজ্জ্বল অংশ। এটা ৩০০ কিমি বেধের জ্বলন্ত গ্যাসের স্তর নিয়ে গঠিত। এটি চূড়ান্তভাবে অসম তল – যাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র উজ্জ্বল অংশ – গ্র্যানুল (Granule) দেখা যায়। এদের গড় ব্যাস ১০০০ কিমি। ভিতরের উত্তপ্ত গ্যাস বাইরের স্তরে ছড়িয়ে পড়ে ঠান্ডা হয় এবং পুনরায় ভিতরে চলে যায়। এই গ্র্যানুলগুলির নিটফল হল, পরিচলন স্রোতের মাধ্যমে উষ্ণগ্যাস বহিঃস্তরে এবং শীতল গ্যাস ভিতরের স্তরে পৌঁছায়। ফোটোস্ফিয়ারের ৯০% হাইড্রোজেন এবং ১০% হিলিয়াম। এই স্তরের গড় তাপমাত্রা ৬০০০K – যা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে।

(খ) **ক্রোমোস্ফিয়ার** – ফোটোস্ফিয়ারের পরিবর্তী পাতলা জ্বলন্ত গ্যাসের স্তরকে ক্রোমোস্ফিয়ার বলা হয়। এই স্তরের গ্যাস সামান্য চাপে থাকে এবং কণিকাগুলি যথেষ্ট গতিশীল থাকে, যারা সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। ইলেক্ট্রন, প্রোটনের ন্যায় পারমাণবিক কণিকাগুলির, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাকেই **সৌর ঝড়** বলা হয়।

(c) **কোর** ঃ সূর্যের একেবারে ভিতরের অংশকে কোর বলা হয়। এখানকার তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট এবং ঘনত্ব প্রায় ১৫০,০০০ kg/m^3 যা সীসার ঘনত্বের প্রায় ১০ গুণ। এখানে গ্যাসগুলি প্লাজমা অবস্থায় থাকে। এই বিপুল তাপমাত্রা ও ঘনত্বের জন্য কোর অঞ্চলে, নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়ায় (Nuclear Fussion) ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র মিলিত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র গঠিত হয়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) যোগ করলে যে ভর পাওয়া যায়, এই বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রের ভর তার থেকে সামান্য কম। এই ভরের পার্থক্য যদি Δm হয়, তবে আইনস্টাইনের ভর শক্তির সমন্বয় সূত্র [$E = \Delta mC^2$] থেকে বলা যায়, ভর হ্রাসটুকু শক্তিরূপে সূর্যের কেন্দ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কেন্দ্রের কাছে প্রচন্ড তাপের জন্য গ্যাস-এর পক্ষে পরমাণু গঠন করে থাকা সম্ভব হয় না। ইলেক্ট্রনগুলি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়। নিউক্লিয়ার সংযোজন পদ্ধতিতে কোরে প্রতি একক সময়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা সূর্যের কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এই বিক্রিয়ার হার বেড়ে গেলে কোর বেশি উত্তপ্ত হয় এবং প্রসারিত হয়। সূর্যের মধ্যে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় সংযোজন বিক্রিয়ার হার কমে যায় এবং কোর-এর আয়তন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে কোর-এর বিক্রিয়ার হার একটা সাম্য বজায় রাখে, যাকে Self Correcting Equilibrium বলা হয়।

সৌরকলঙ্ক (Sun Spot)

সূর্যের বাইরের স্তরে কতগুলি কালো অংশ দেখা যায়। এই অংশগুলির তাপমাত্রা ক্রোমোস্ফিয়ারের অন্যান্য অংশের তাপমাত্রা থেকে ১৫০০°C কম। প্রাচীনকালে, নক্ষত্রবিদরা এই কালো অংশগুলিকে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশের মেঘ বলে ধারণা করতেন।

গ্যালিলিও সর্বপ্রথম বলেন যে, ঐ কালো অংশগুলি মেঘ নয়, সূর্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট। এই সৌরকলঙ্কগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভাবে আয়ুস্কাল কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হয়। অসংখ্য সৌর কলঙ্ককে ১১ বছরের এক আবর্তন চক্রে দেখতে পাওয়া যায়। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সময়ের সাপেক্ষে বাড়তে বাড়তে একসঙ্গে ১০০ বা তার বেশি দেখা যায়। আবার কমে যায়। গত প্রায় ২০০ বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা সৌরকলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধির ১১ বছরের চক্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। যেমন ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সূর্যের গায়ে কলঙ্কের সংখ্যা ছিল খুব বেশি (প্রায় ১২০টি), যা ১৯৯৫ সালের মে মাসে ছিল ১০টি। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গড়ে প্রায় ১৫০টি নতুন সৌর কলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর মসনদে যখন ঔরঙ্গজেব তখন একবার হঠাৎ সূর্যের গায়ের সৌরকলঙ্ক উধাও হয়ে গিয়েছিল, ইউরোপে তখন ৩০ বছরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, আবার তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। ঐ সময় প্রায় অর্ধশতাব্দীর জন্য সৌরকলঙ্ক দেখা যায়নি। কিন্তু পৃথিবীতে, প্রধানত ইউরোপে তখন শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও শীতলায়নের জন্য সৌরকলঙ্কই একমাত্র কারণ নয়। তাই যদি হত তবে সেই সময় পৃথিবীর গড়তাপমাত্রা কমার বদলে বাড়তো। সৌর কলঙ্ক উধাও হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় পৃথিবীর শীতল হওয়ার অন্য কারণ আছে, যা পরবর্তিতে চর্চা করা হচ্ছে। ২০০১ সালে সূর্যের গায়ে কলঙ্কের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল এবং নিয়ম মেনেই তা কমে আসছিল। ২০০৮ সালে সূর্য প্রায় কলঙ্কহীন হয়ে পড়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী ২০১০, ২০১১তে এই সংখ্যা বাড়ার কথা। কিন্তু কোথায় তা? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের ভিতর প্রচন্ড উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাইরের স্তরে এসে ছড়িয়ে পড়ে শীতল হয়, শীতল গ্যাস আবার ভিতরে প্রবাহিত হয়। কিছু কিছু জায়গায় গ্যাসের এই পরিচলন স্রোত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভিতরের গ্যাস বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা। তাই এই অংশগুলির তাপমাত্রা, অন্যান্য অংশগুলির তুলনায় কমে যায়। যেহেতু

তাপমাত্রা কম থাকে, সেহেতু গ্যাসের উজ্জ্বল্য কম হয়, তাই ঐ অংশগুলি থেকে আসা আলোর পরিমাণ কম হয়। পার্শ্ববর্তী অংশের সাপেক্ষে ঐ অংশগুলিকে আপেক্ষিকভাবে কালো দেখায়। এখন, ঐ অংশে গ্যাসগুলির পরিচলন স্রোত বন্ধ হওয়ার কারণ কী ?

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সূর্যের ভিতরের তাপমাত্রা অত্যধিক হওয়ায়, গ্যাসগুলি পারমাণবিক অবস্থায় থাকে না, ইলেক্ট্রনগুলি যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রোটন, ইলেক্ট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গতিশীল হয়। যেহেতু গতিশীল আধানই তড়িৎ প্রবাহের কারণ এবং প্রবাহী তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, তাই গ্যাসের পরমাণুর বিচ্ছিন্ন গতিশীল ইলেক্ট্রনগুলির দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের, চৌম্বক শক্তির প্রভাবে গ্যাসের পরিচলন স্রোত বন্ধ হয়। এই চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তনশীল এবং সূর্যের সব অংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাণ সমান নয়। সূর্যের বাইরের স্তরে যে সব অংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাণ বেশি, সেই সব অংশে গ্যাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই সব জায়গায় সৌরকলঙ্কের সৃষ্টি হয়। চুম্বকের দুটি মেরুর মধ্যে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে। সৌরকলঙ্কের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। সূর্যের গায়ে সৌরকলঙ্ক সব সময় জোড়ায় জোড়ায় দেখা যায়।

ইলেক্ট্রনের মত তড়িৎবাহী কণার ধর্মই হল চৌম্বক বলরেখা বেয়ে চলা। সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ইলেক্ট্রনগুলি, সূর্যের গায়ে চৌম্বক বলরেখার পথ ধরে চলে। কখনো কখনো তারা এক জোড়া সৌরকলঙ্কের মধ্যে যে বলরেখা রয়েছে সেই পথ ধরে চলাচল করে। এই সময় ইলেক্ট্রনগুলি এক ধরনের অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করে। সম্প্রতি মহাকাশ যান থেকে তোলা ছবিতে এই অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra Violate Ray) দেখা গেছে। যার মাধ্যমে সৌরকলঙ্কগুলির মধ্যকার চৌম্বক ক্ষেত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবেই ২০০ বছরের সৌরকলঙ্কের চক্রও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, প্রতি ১০ কোটি বছরে সৌর বিকিরণ ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সৌরকলঙ্ক কম-বেশি হওয়ার জন্য সূর্য থেকে বিকিরিত তাপও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। যদিও এই পরিবর্তনের পরিমাণ সামান্য। কিন্তু এর ফল সামান্য নয়। এর ফলেই পৃথিবীতে ছোট ছোট পর্যায়ের কুলিং ও ওয়ার্মিং ঘটে চলে। আবার এর প্রভাবেই বায়ুমন্ডলের বাইরের স্তর শীতল হয়ে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে আসে, যার ফলে বায়ুমন্ডলীয় স্তরে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহের উপর ঘর্ষণ বল বৃদ্ধি পায় এবং কক্ষপথ পাল্টে যায়।

সূর্য থেকে কতটা তাপ কিভাবে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়

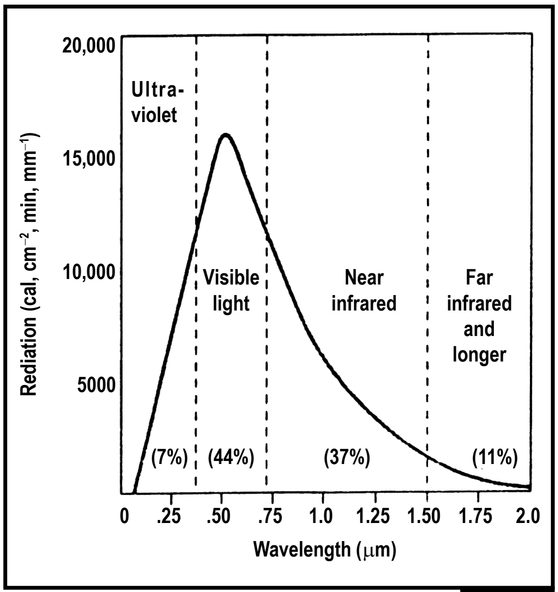

চিত্র ঃ ৩

ঃ পরমশূন্য (OK, -273^{0}C) তাপমাত্রার অধিক তাপমাত্রার যে কোন বস্তুই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে শক্তি বিকিরণ করে। যার বেগ আলোর বেগের সমান। বিকিরিত শক্তি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গের প্রকৃতি (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বিস্তার, কম্পাঙ্ক) যা থেকে শক্তি বিকিরিত হচ্ছে তার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। [চিত্র - ৩]

স্টিফেন-বোলজ্ম্যান এর সূত্র থেকে এই বিকিরণের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়।

$$F = \sigma T^4$$

[F = বিকিরণের ফ্লাক্স ঘনত্ব,

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W / m^2 K^4$

T = বস্তুর উপরিতলের তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে]

সূর্যের উপরিতলের গড় তাপমাত্রা ৬০০০K, আর পৃথিবীর উপরিতলের গড় তাপমাত্রা ২৮৮K। সুতরাং সূর্যের উপরিতলের গড় তাপমাত্রা, পৃথিবীর উপরিতলের গড় তাপমাত্রার ২০ গুণের থেকে বেশি।

$$\therefore F_e = \sigma T_e^4$$
$$\therefore F_s = \sigma T_s^4$$
$$\rangle \sigma \left(20T_e\right)^4 \left[\because T_s \rangle 20T_e\right]$$

$$\rangle 160000\sigma T_e^4$$

$$\rangle 160000 F_e$$

F_e = পৃথিবীর বিকিণের ফ্লাক্স ঘনত্ব
F_s = সূর্যের বিকিণের ফ্লাক্স ঘনত্ব
T_e = পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে
T_s = সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে]

সুতরাং সূর্যের প্রতি একক ক্ষেত্রফল থেকে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ, পৃথিবীর প্রতি একক ক্ষেত্রফল থেকে বিকিরিত শক্তির ১৬০০০০ গুণ অপেক্ষা বেশি। সূর্য নিজেই তাপের উৎস হওয়ায় তা থেকে ধারাবাহিক ভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০^{৫} মিটার থেকে শুরু করে ১০$^{-৮}$ মিটার পর্যন্ত) বিকিরিত হয়।

উইনস্ এর সূত্র (Wien's law) $\lambda_{\max} = \dfrac{2897}{T}$, থেকে বলা যায়, শক্তি বিকিরণকারী বস্তুর তাপমাত্রা যত বেশী হবে, বিকিরিত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত কম হবে।

$$\therefore \lambda_s = \frac{2897}{6000} = 0.48\mu m \quad \text{এবং} \quad \lambda_e = \frac{2897}{288} = 10\mu m$$

[λ_s = সূর্য থেকে বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য;

λ_e = পৃথিবী থেকে বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য]

বাস্তবে, সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির অধিকাংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $0.4\mu m - 0.7\mu m$ ।

এছাড়া, শক্তির বিকিরণ ও শোষণ সম্পর্কিত সূত্রগুলি হল –

$(i)\ C = \lambda f$

[যেখানে λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $C = 3\times10^8 m/s$,

f = কম্পাঙ্ক]

এই সূত্র অনুসারে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, কম্পাঙ্ক তত বেশী হবে।

$(ii)\ F = \varepsilon\sigma T^4$ [যেখানে $\varepsilon \langle 1$]

এই সূত্রানুসারে, কৃষ্ণবস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু উত্তম বিকিরক (Rediator) নয়।

$(iii)\ e_\lambda = E_\lambda \cdot a_\lambda$

[e_λ = বিকিরণ ক্ষমতা, a_λ = শোষণ ক্ষমতা, ঐ উষ্ণতায় ঐ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিকিরণের জন্য আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা = E_λ]

এই সূত্র থেকে বলা যায় যে বস্তু যত ভাল তাপ শোষক, সেই বস্তু তত ভাল তাপ বিকিরক।

$(iv)\ E = h\upsilon$

[h = প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক, υ = বিকিরণের কম্পাঙ্ক, E = বিকিরিত শক্তি]

এই সূত্র থেকে বলা যায় বিকিরণের শক্তি কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।

সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ স্থান ফাঁকা বলে, সৌরশক্তি বিকিরণ পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলে পৌঁছায়। পৃথিবী, সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির মাত্র ১/২০০,০০০০,০০০ অংশ গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে গড় দূরত্ব ১৪৯.৫ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) কিলোমিটার। গণনা করে দেখা গেছে, বায়ুমন্ডলের বহিঃস্তরের বহিঃপৃষ্ঠের লম্বভাবে সৌরকিরণ পড়ে ১৩৬৭ w/m^2 (১.৯৭. জুল/সেমি^{২}/মিনিট) - যা Solar Constant নামে পরিচিত। এই সৌরবিকিরণ বায়ুমন্ডলের বহিঃস্তর থেকে বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় চারটি ঘটনা ঘটে –

(১) **প্রতিফলন (Reflection)** ঃ বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা সৌর বিকিরণের বেশ কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে বিলীন হয়। প্রতিফলকের প্রকৃতি ও পুরুত্ব অনুযায়ী ৪০%-৯০% বিকিরণ প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের একটি বড় অংশ জল দ্বারা আবৃত। বিকিরণের আপাতন কোণ এবং জলের উপরিতলের মসৃণতার উপর নির্ভর করে প্রতিফলনের হার হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। সাদা মেঘ, বরফ আবৃত পর্বতচূড়া থেকে ৭৫%-এর বেশি প্রতিফলিত হয়। স্থল ভাগ, জল ভাগ, বায়ুমন্ডল (মেঘ) থেকে গড়ে ৩০% সৌর বিকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। এই ঘটনা Planetary Albedo নামে পরিচিত। প্রতিফলিত এই শক্তির পৃথিবীর তাপচক্রে কোন ভূমিকা নেই।

(২) **বিক্ষেপণ (Scattering)** ঃ এই পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত ক্ষুদ্রকণা ও গ্যাসের অণু সৌর বিকিরণের কিছু অংশকে ভিন্ন অভিমুখে বিক্ষেপণ করে। বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালিশ এই তত্ত্বের আবিষ্কারক। বিক্ষেপণের পরিমাণ ও দিক নির্ভর করে কণা/গ্যাসের অণুর ব্যাসার্ধ ও বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাতের উপর। এছাড়া বিক্ষেপণের পরিমাণ

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক।

$$(Scattering) \propto \frac{1}{(Wavelength)^4}$$

$$\therefore \theta \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

এই গাণিতিক সম্পর্ক থেকে বলা যায়, ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ, বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ অপেক্ষা সহজেই বিক্ষিপ্ত হতে পারে। জানা দরকার বিকিরণের এই বিক্ষেপণের জন্যই আকাশের বর্ণ নীল দেখায়। সৌর বিকিরণের দৃশ্যত অংশ (visible range) বায়ুমন্ডলের সর্ব বহিস্তরে প্রবেশ করার পর গ্যাসের ক্ষুদ্র অণু দ্বারা ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের বিক্ষেপণ ঘটে।

বেগুনী বর্ণের আলো প্রায় বিক্ষিপ্ত ও শোষিত হয়। তাই আকাশ কখনো বেগুনী দেখায় না। আবার নীল বর্ণের আলো বায়ুমন্ডলের নীচের স্তরের মধ্য দিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, তাই আকাশ নীল দেখায়। বিক্ষেপণের ফলে সৌর বিকিরণের একটা অংশ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সরাসরি কোন সৌর বিকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় না, যতটুকু বিকিরণ পৌঁছায় তা বিক্ষেপণের (Sky radiation)মাধ্যমে। বিক্ষেপণের ফলে সৌর বিকিরণের যে অংশ মহাকাশে ফিরে যায় ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্তকরণে তার কোন ভূমিকা নাই। মেরু অঞ্চলে, তাপচক্র বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় সাম্য বজায় রাখে।

(৩) **শোষণ (Absorption)** ঃ এই পদ্ধতিতে আপতিত বিকিরণকে ধরে রাখা হয় এবং তা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষিত বিকিরণ বোধগম্য তাপে রূপান্তরিত হয় যা ঐ বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। বায়ুমন্ডলের গ্যাস অণু, মেঘ, কুয়াশা, ধুঁয়া, ধূলিকণা আগত সৌর বিকিরণের কিছু অংশ শোষণ করে। বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে সৌর বিকিরণের শোষণ হার বিভিন্ন এবং বিভিন্ন গ্যাস তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর বিভিন্ন অংশ শোষণ করে। যেমন ওজন (O^3) স্তর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আল্ট্রা ভায়লেট বিকিরণকে শোষণ করে। অধিকাংশ সৌর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 0.5 μ m মধ্যে। নাইট্রোজেন এই বিকিরণের ভাল শোষক নয়। বায়ুমন্ডলের আয়নস্ফিয়ার স্তরে বেশি শোষণ হয়। জলীয় বাষ্প অবলোহিত রশ্মি (infrared ray) শোষণ করে। কিন্তু গ্যাসগুলির কোনটাই তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর দৃশ্যত অংশের ভাল শোষক নয়, ফলে দৃশ্যত অংশের (visible range) ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছানোর ভাল সুযোগ থেকে যায়। আবার সৌর বিকিরণের বেশিরভাগ অংশ দৃশ্যত-অংশের মধ্যেই পড়ে। [চিত্র ঃ ৪]

(৪) **সঞ্চালন (Transmission)** ঃ প্রতিফলন, বিক্ষেপণ, শোষণের পরেও বিকিরণের যে অংশ শেষ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে

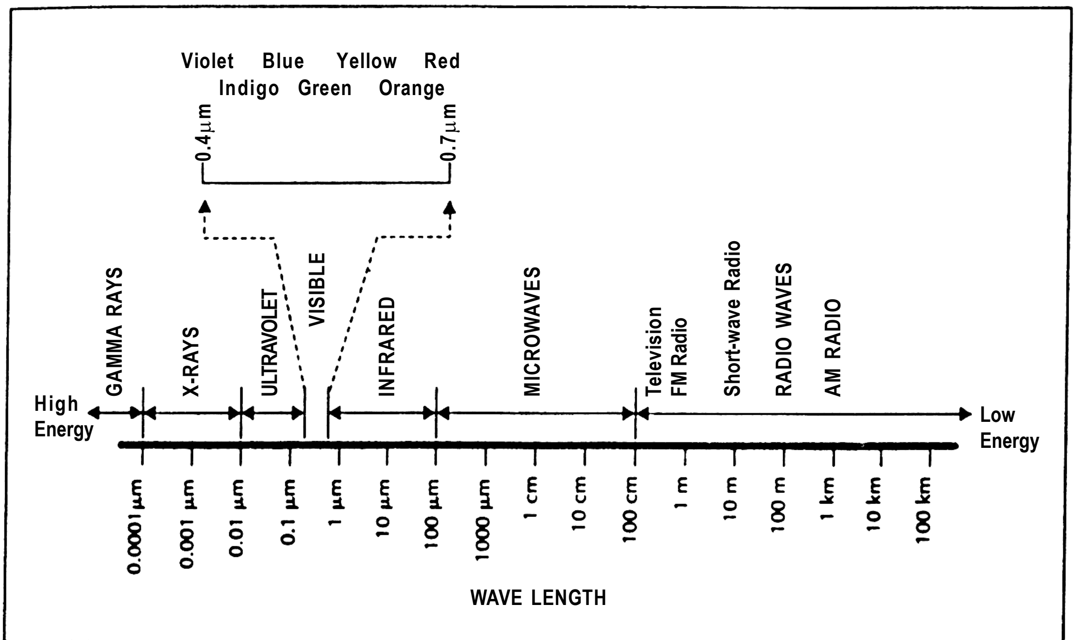

চিত্র ঃ ৪

পৌঁছায়, তাই সঞ্চালিত হয়। সঞ্চালন নির্ভর করে বায়ুমন্ডলের অবস্থা এবং সৌরশক্তিকে বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে কত পথ অতিক্রম করতে হল তার উপরে। সৌরশক্তি বায়ুমন্ডলের যে পথ অতিক্রম করে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় তাকে পথদৈর্ঘ্য বলা হয় (Path length or Optical air mass)। পথদৈর্ঘ্যের মান ১ ধরা হয়, যখন সূর্য অনুভূমিক তলের সাথে ৯০° কোণে অবস্থান করে। সূর্যের উন্নতি কোণ যত হ্রাস পায়, পথদৈর্ঘ্য তত বৃদ্ধি পায়।

সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থান-এর পরিবর্তন নির্ভর করে–

(১) পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতির পরিবর্তনের উপর

(২) পৃথিবীর কক্ষপথের Tilt এবং

(৩) পৃথিবীর অক্ষের Tilt এর জন্য

[চিত্র ঃ ৫ এবং ৬]

(১) সূর্যকে ফোকাসে রেখে উপবৃত্তাকার পথে, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই উপবৃত্তাকার পথটি ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তনশীল। এই কক্ষপথটির উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity) পর্যায়ক্রমে ছোট থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোটো হয়। যার পর্যায়কাল ১,০০,০০০ বছর।

আমরা জানি, উপবৃত্তাকার পথের উৎকেন্দ্রতা (e) এর মান ১ এর কম এবং

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

যেখানে $e \langle 1$ এবং $a \rangle b$

$$\left[2a = lenght\, of\, major\, axis, 2b = minor\, axis\right]$$

e এর মান কমার অর্থ $\frac{b^2}{a^2}$ এর মান বৃদ্ধি। আবার $\frac{b^2}{a^2}$ এর মান বৃদ্ধির অর্থ $b \to a$ অথবা $a \to b$

পৃথিবীর ক্ষেত্রে, $0.0607 \geq e \geq 0.005$ বর্তমানে $e_E = 0.0167$

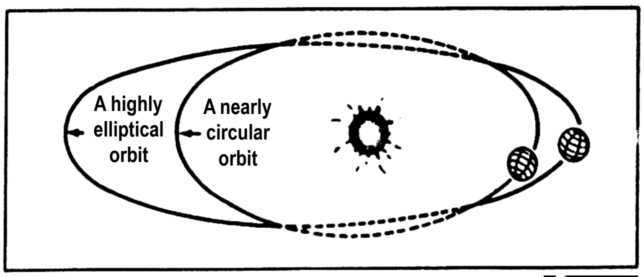

(a)

চিত্র ঃ ৫

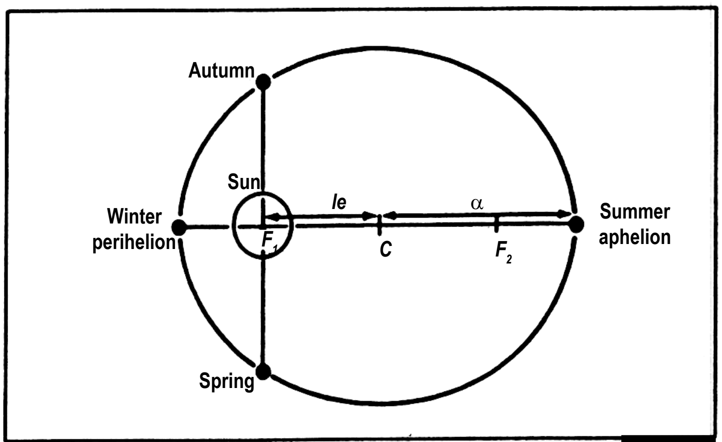

(b)

চিত্র ঃ ৬

Changes in earth's orbit around the sun : (a) Over time, the orbit changes from elliptical to almost circular; (b) Eccentricity of the orbit. The Sun is one focus (F_1) of the elliptical orbit. The distance from the center (*C*) to aphelion or perihelion is given by half the major axis α. The distance from *C* to F_1 is linear eccentricity (*le*) which is used to determined eccentricity (*e*), which is given by $e = le/\alpha$.

e-এর এইহ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থাৎ বড় উপবৃত্তাকার পথ থেকে ক্রমশ ছোটো প্রায় বৃত্তাকার পথে, আবার ছোটো প্রায় বৃত্তাকার পথ থেকে বড় উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে আবর্তন করাই পর্যায়ক্রমে তুষার যুগের আগমনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কক্ষপথের এই রূপ হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। সূর্য থেকে বিকিরিত সৌরশক্তির, বিশেষতঃ ছোটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে কম পরিমাণে পৌঁছায়।

(২) পৃথিবী যে কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই কক্ষপথ অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবী অবস্থানকারী তল-এর ওঠা-নামা হয়। এই ওঠা-নামাও, ৭০,০০০ বছরের পর্যায়কাল যুক্ত সরল দোলগতিতে ঘটে। এই কারণে পৃথিবীর কক্ষপথ দ্বি-মাত্রিক উপবৃত্তাকার হয় না। এই ঘটনার কারণ, সূর্য-চন্দ্র সহ অপর গ্রহ-নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলের প্রভাব। এই ঘটনার জন্য Perehelion-এর পরিবর্তন ঘটে, তাই একেPerehelion Precession বলা হয়। [চিত্র ঃ ৭]

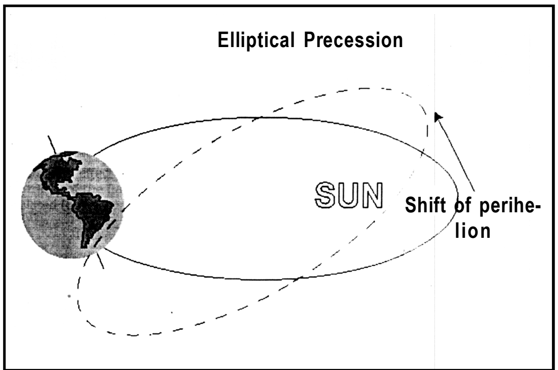

চিত্র ঃ ৭

(৩) Precession হল কোন ঘূর্ণায়মান বস্তুর ঘূর্ণায়মান অক্ষের অগ্রগতি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে, অক্ষীয় অগ্রগতি (Axial Precession) হল, মহাকর্ষের দ্বারা আবেশিত কোন মহাজাগতিক বস্তুর ঘূর্ণায়মান অক্ষের ধীর ও ধারাবাহিক অবস্থান পরিবর্তনের ঘটনা। আমরা জানি, পৃথিবী যে তলে বর্তমানে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেই তলের সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ ৬৬.৫° কোণে অবস্থান করছে। সুতরাং এই তলের উপর লম্বের সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ ২৩.৫° কোণে অবস্থান করছে। একে বক্রতা কোণ (Obliquity Angle) বলা হয়। কিন্তু এই কোণটির মান ধ্রুবক নয়। পৃথিবীর ঘুর্ণন অক্ষ, সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণন তলের সাপেক্ষে ২২° থেকে ২৫° কোণে, ৪১০০ বছরের পর্যায়কালে সরল দোল গতিতে আবর্তিত হয়। [চিত্র ঃ ৮] ফলে ঘূর্ণন অক্ষের দুই প্রান্ত বিন্দুর সঞ্চার পথের পরিবর্তন হয়। ত্রিমাত্রিক ফ্রেমে ঘূর্ণন-অক্ষের এই রূপ অবস্থান পরিবর্তনের জন্য, অক্ষের দুই প্রান্তে দুটি বৃহৎ শঙ্কুর সৃষ্টি হয় প্রায় ২৬,০০০ বছরের চক্রে। যাকে বলা হয় Great or Platonic Year. বক্রতাকোণ শূন্য (০) হলে, পৃথিবীর সকল অঞ্চলে দিন-রাত্রির সময় সমান হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে না।

কিন্তু পৃথিবীর এই বক্রতা কোণের পরিবর্তন ঘটে কেন ?

প্রধানত সূর্য-চন্দ্রের মহাকর্ষের বলের প্রভাবে এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুকণার মহাকর্ষের প্রভাবে এই ঘটনা ঘটে। যেহেতু মহাজগতের (সৌর জগতের) প্রতিটি বস্তুই গতিশীল এবং তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং পৃথিবীর উপর ঐ বস্তুগুলির (সূর্য-চন্দ্র সমেত) মহাকর্ষ বলের পরিবর্তন ঘটে, কারণ মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই মহাকর্ষ বল পৃথিবীর অক্ষের উপর প্রায় লম্বভাবে ক্রিয়া করলেও অক্ষের দুই প্রান্তের ঘূর্ণায়মান তলের ক্ষেত্রে ঐ বল সমান্তরালভাবে ক্রিয়া করে। পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকৃতির নয় বরঞ্চ দুই মেরুতে কিছুটা চাপা, এই আকৃতিকে Oblate Spheroid বলা হয়। এর নিরক্ষ ব্যাস, মেরু ব্যাস অপেক্ষা ৪৩ কিমি বেশি। পৃথিবীর অক্ষের Tilt-এর জন্য নিরক্ষীয় এই স্ফিত অংশের অর্ধেক সূর্যের নিকট, অপর অর্ধেক সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। মহাকর্ষ বল যেহেতু দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক, তাই নিকটবর্তী অংশে মহাকর্ষ বল দূরবর্তী অংশের আকর্ষণ বল অপেক্ষা শক্তিশালী। নিরক্ষীয় অক্ষের দুই প্রান্তে দুটি অসম বলের প্রভাবে পৃথিবীর উপর একটি টর্ক ক্রিয়া করে। এই টর্কের অক্ষ মোটামুটিভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের উপর লম্ব, ফলে ঘূর্ণন অক্ষের Precession ঘটে। গড় টর্ক যেহেতু, ঘূর্ণন অক্ষের Tilt এর অভিমুখের সঙ্গে লম্ব, তাই এই টর্ক ঘূর্ণন অক্ষের Tilt-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে না। চন্দ্র-সূর্যের নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের পরিবর্তন ঘটলে, পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের Tilt এবং Precession এর গতি পরিবর্তন হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের Tilt ২৩.৫°। এই কোণের মান পরিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীতে ঋতুচক্রে বড় মাপের পরিবর্তন ঘটে। যখন অক্ষীয় Tilt কম হয় তখন শীত ও গ্রীষ্মে প্রায় সমভাবে সৌরকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছায়। আবার এই অক্ষীয় Tilt-এর জন্যই নিরক্ষীয় অঞ্চল ও মেরুতে সৌরশক্তি শোষণের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান ঘটে। অক্ষীয় Tilt ও Precession-এর জন্য পৃথিবীতে মেরু ও নিরক্ষ রেখার অবস্থান পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু সৌরজগতের

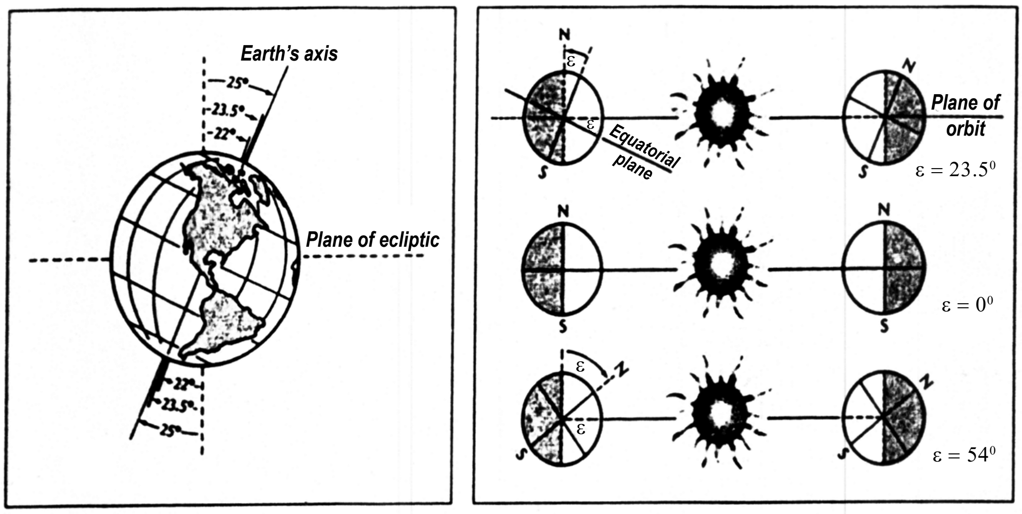

(a) (b)

Obliquity of the ecliptic : (a) The amount of tilt of the earth axis changes between 22 ⁰ and 25⁰ over a 41, 000 year period. The present value is 23.5⁰; (b) In the three cases shown (present angle, 0⁰ and 54⁰), the earth climate would change appreciably.

চিত্র ঃ ৮

সাপেক্ষে পৃথিবীর মেরু ও নিরক্ষ অঞ্চলের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবীর অক্ষের Tilt, Precession, কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতার পরিবর্তন এবং কক্ষপথের Tilt ও Precession কে একত্রে **মিলানকোভিচ (Milancovich) চক্র** বলা হয়। [চিত্র ঃ ৮]

পৃথিবীর তাপচক্রের ভারসাম্য

সৌর বিকিরণের যে অংশ শেষপর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে এবং বায়ুমন্ডলে পৌঁছায় তা বিকিরণ, বাষ্পায়ন (বাষ্পমোচন সমেত) এবং পরিবহন-পরিচলন পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ কর্তৃক বিকিরিত তাপ -এর একটা অংশ মহাকাশে ফিরে যায় এবং বাকি অংশ "গ্রীন হাউস" প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে।

ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলে তাপ গ্রহণ ও বর্জন পৃথক পৃথকভাবে এবং সামগ্রিকভাবে একটা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। একেই তাপীয় সাম্য বলা হয়। এই তাপীয় সাম্য গতিশীল ও জটিল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত শক্তি নির্ভর করে –

(ক) সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ, এবং

(খ) সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থানের উপর। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সৌরকলঙ্কের উপর নির্ভর করে সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থানের এক একটি পর্যায়, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত শক্তির বাৎসরিক গড় মান মোটামুটি একই, কিন্তু ধ্রুবক নয়।

ভূ-পৃষ্ঠের অর্জিত তাপ বায়ুমন্ডলে সঞ্চালিত হয়, বোধগম্য তাপ ও জলকে জলীয় বাষ্পে রূপান্তরের মাধ্যমে। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরে মাত্র কয়েক সেমি পর্যন্ত পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়। বায়ু তাপের কুপরিবাহী এবং গ্যাসীয় মিশ্রণ হওয়ায় বায়ুমন্ডলের নীচের স্তর থেকে তাপ, পরিচলন স্রোত সৃষ্টির মাধ্যমে উপরের স্তরে সঞ্চালিত হয়। পৃথিবীর উপরিভাগের উন্মুক্ত জলতল যে সৌরশক্তি অর্জন করে, তাতে যে পরিমাণ জল অণুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে, Potential Barrier অতিক্রম করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলে মুক্ত হয়। এছাড়া উদ্ভিদ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায়, বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে। ঐ জলীয়-বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হওয়ার সময় বায়ুতে তাপ বর্জন করে।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে Kitt Peak National

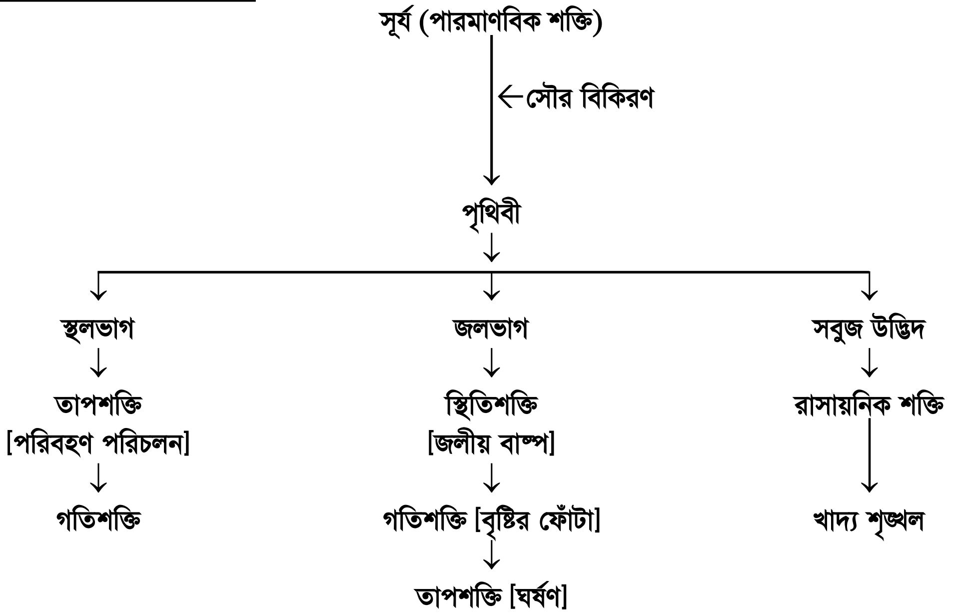

Observetory-এর পরিমাপ থেকে দেখা যায় ১ বছরে সূর্যের বহিঃস্তরের তাপমাত্রা ১১°C কমে গিয়েছিল। কম্পিউটারের গণনায় জানা গেছে সৌর বিকিরণ ১-২% কমে গেলে ছোট তুষার যুগের এবং সৌর বিকিরণ ৫% কমে গেলে বড় তুষার যুগের আগমন ঘটবে। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ৫৮°C যা ১৯২২ সালে লিবিয়ার আল আজিজ-এ পরিমাপ করা হয়েছিল। আবার নথিভুক্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল –৮৯°C যা ১৯৮৩ সালে আন্টার্কটিকায় পরিমাপ করা হয়েছিল।

গ্রীন হাউস এফেক্ট

গ্রীন হাউস হল শীত প্রধান দেশের অঙ্কুরিত বীজের বা চারাগাছের বৃদ্ধির জন্য কাঁচ নির্মিত এক বিশেষ প্রকার ঘর। এর বিশেষত্ব হল - কাঁচ একমুখী পথের কাজ করে। অর্থাৎ এতে ব্যবহৃত কাঁচের ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সূর্যালোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু কক্ষের ভিতরের বস্তুর বিকিরিত বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শক্তি কাঁচের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে যেতে পারেনা। ফলে কাঁচের ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সূর্যের বহিঃস্তরের গড় তাপমাত্রা (৬০০০K) অপেক্ষা পৃথিবীর বহিঃস্তরের তাপমাত্রা (২৮৮K সেন্টিগ্রেড) অনেক কম। স্বাভাবিক ভাবেই তাই সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা পৃথিবী থেকে বিকিরিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বড়। এমন কি পৃথিবী থেকে বিকিরিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান ১০μm পর্যন্ত হয়। যা সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা কুড়ি গুণ বেশি। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরো ফ্লুরোকার্বন (CFC), NO (নাইট্রিক অক্সাইড), জলীয় বাষ্প (H_2O)-এর উপস্থিতি গ্রীন হাউসের ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সৌর বিকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়, কিন্তু বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাপশক্তি বায়ুমন্ডল ভেদ করে মহাকাশে বিলীন হতে পারে না। বায়ুমন্ডলে "গ্রীন হাউস" এফেক্ট একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। পৃথিবীর তাপচক্রের সাম্য রক্ষা করতে জলচক্রের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প (H_2O) সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনের ফলে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) মুক্ত হয় [শিল্প-কারখানার ও পরিবহনে ফসিল ফুয়েলের ব্যবহারেও (CO_2) উৎপন্ন হয়]। মৃত উদ্ভিদ, প্রাণী ও জৈব পদার্থ থেকে মিথেন উৎপন্ন হয়।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির জলবায়ু অধ্যাপক রিচার্ড এস লিন্ডজেন ও তার অনুগামীদের মতে –

IPCC-এর বিজ্ঞানীরা গ্রীন হাউস এফেক্ট এর ক্ষেত্রে CO_2 ও (CH_4) এর ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করেছে যদিও (CO_2) ও (CH_4) না থাকলেও, গ্রীন হাউস এফেক্টের ৯৮% থাকবে। কারণ গ্রীন হাউস এফেক্ট মূলত জলীয় বাষ্পের জন্য ঘটে।

গ্রীন হাউস গ্যাস – কার্বন ডাইঅক্সাইড

শিল্পের বিকাশের জন্য, পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি - যার গ্রীন হাইস এফেক্ট থাকার ফলে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটছে।

কিন্তু মানুষ জ্বালানীর ব্যবহার শুরু করার বহু পূর্ব হতে প্রায় ১৮০০০ বছর ধরে অতি ধীরে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়ছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের Vostok-এর আন্টার্কটিকার ice core data থেকে পাওয়া যায়, পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। [চিত্র ঃ ৯] কিন্তু গত ৮০০ বছরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পিছিয়ে পড়েছে। ঘটনাচক্রে বর্তমানের তাপমাত্রা ও কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ আজ থেকে ১৪০,০০০-১২০,০০০ বছর পূর্বের, আন্তঃ তুষার যুগের অনুরূপ। ভূ-বিজ্ঞানে, ২০,০০০ বছরের স্থায়ী ঐ আন্তঃ তুষার যুগকে, **Eemian Interglacial period** বলা হয়।

বর্তমানে, গ্রীন হাউস গ্যাস-এর মাত্র ০.২৮% মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ৯৯.৭২%। সকল উৎস থেকে প্রতি বছরে গড়ে ১৮৬ বিলিয়ন টন কার্বন, কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত হয়। যার মধ্যে মাত্র ৬ বিলিয়ন টন মানুষের ক্রিয়া কলাপের জন্য। ভূতাত্ত্বিকদের মতে ক্রিটেসিয়াস যুগে গ্রীণহাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর গড় উষ্ণতাবৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছিল, সর্বাধিক, যা বর্তমান যুগের তুলনায় অনেক বেশী। সেই সময় সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধি হয়েছিল সর্বাধিক। সেইসময় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর আসল কারণ অ্যান্থ্রোপোজেনিক নয়।

ভূ-তাত্ত্বিক সময় স্কেলের সাপেক্ষে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বায়ুমন্ডলে CO_2-এর পরিমাণ দুর্বল (কম)।

কার্বন ডাই অক্সাইড, জীবজগতের খাদ্যের মৌলিক উপাদান–দেহ পরিপোষক, এটা কোন দূষিত বা বিষাক্ত গ্যাস নয়। CO_2 না থাকলে সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যেত।

CO_2 একটি বর্ণহীন, স্বাদহীন গ্যাস। বায়ুমন্ডলে যে CO_2 মুক্ত হয় তা

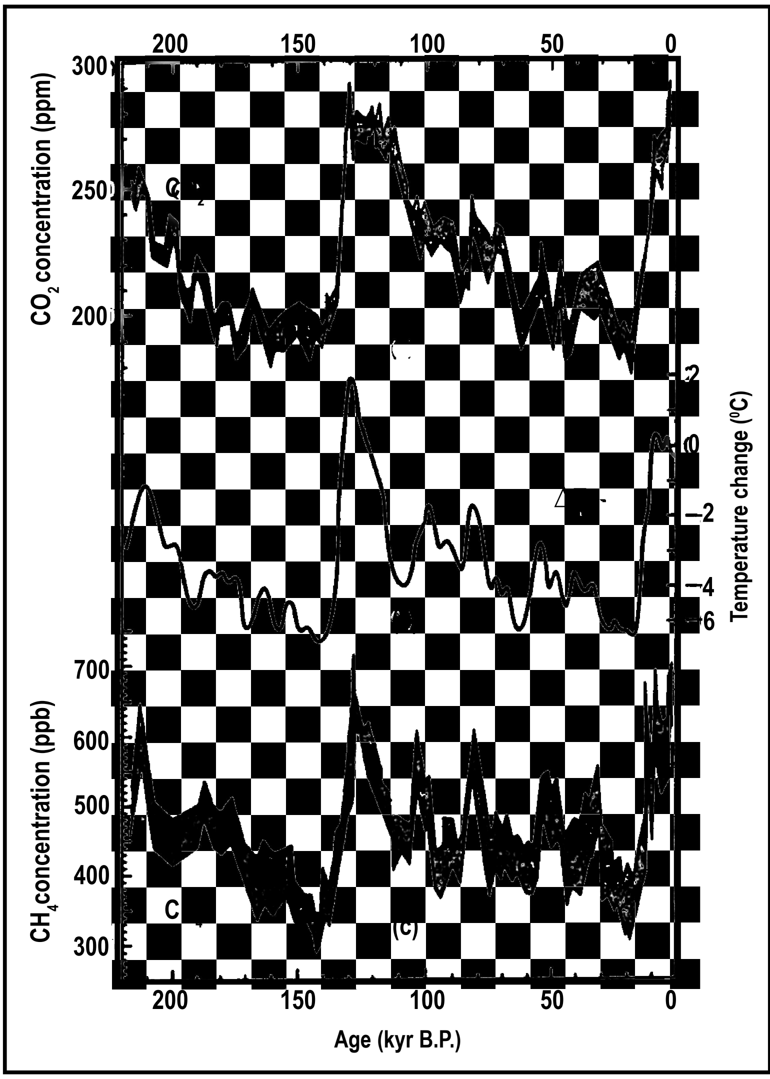

The trend of atmospheric carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4), and temperature as recorded in the Vostok, Antarctica, ice core. The atmospheric temperature at Vostok is plotted as a deviation from present-day mean temperature (ΔT_{atm}). The different line widths represent the ranges in estimates (from Kump L. R., Kasting J. F. and Crane R. G., The Earth System, © 1999, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.).

চিত্র ঃ ৯

বায়ুমন্ডলে স্থায়ী রূপে থেকে না গিয়ে কার্বন চক্রের মাধ্যমে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলকে, ঐ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ধরা হয়, তবে ঐ স্থানের বায়ুতে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে, CO_2 এর আংশিক চাপ বৃদ্ধি পাবে, ফলে দ্রুত তা সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হবে। শীতকালে অনেক সময়, বন্ধ ঘরে, ঘর গরম করার জ্বালানীর দহনে অনেক মানুষ মারা যায়। মারা যাবার কারণ অক্সিজেনের অভাব। CO_2 এর জন্য নয়। আবার যদি O_2 বাড়িয়ে দেওয়া হয় মানুষের কোষের দহনের হার বেড়ে যাবে।Pure Oxygen Breathing হলে মানুষের growth (বৃদ্ধি) বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিবেশের দূষণ রোধক, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের বাজার, বিকল্প জ্বালানীর বাজার সৃষ্টির জন্য পরিবেশ রক্ষার নামে, পরিবেশবাদী ও সংবাদ পরিবেশকদের দক্ষতায় ভুল ও মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে 'বিশ্ব উষ্ণায়ণে'র জন্য গ্রীন হাউস সমস্যাকে হাজির করা হয়েছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়, এই মিথ্যা বক্তব্যের বিরুদ্ধে মুখ না খোলায়, সাধারণ মানুষ বারংবার একই কথা শুনে, মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

তুষার যুগ

পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনও এক রকম থাকেনি। পৃথিবীজুড়ে সর্বত্রও কখনও তাপমাত্রা এক রকম থাকেনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রারও পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কখনও বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। তুষার যুগ বা হিমবাহের যুগ সেই জিওলজিক্যাল সময়কালকে বলা হয় যে সময় পৃথিবীর ত্বক এবং বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা দীর্ঘ সময়কালের জন্য কমে যায়। এই সময়কালে মহাদেশীয় অঞ্চলে, মেরু অঞ্চলে এবং সুউচ্চ পর্বতমালায় হিমবাহ সৃষ্টি হয়। তুষার যুগ হল একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা (Natural system)। একটি বড় তুষার যুগের মধ্যে আবার অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং অপেক্ষাকৃত গরম সময়কালকে লক্ষ্য করা যায়। এই অতিরিক্ত ঠান্ডা সময়কে গ্লেসিয়াল পিরিয়ড (glacial period) এবং মধ্যবর্তী গরম সময়কে আন্তঃতুষার যুগ (interglacial period) বলে। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে তুষার যুগ বলতে সেই সময়কালকে বলা হয় যে সময়কালে পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই (Northern & Southern hemisphere) হিমবাহের অস্তিত্ব থাকে। **এই সংজ্ঞা অনুসারে প্লাইসটোসিন যুগ থেকে যে তুষার যুগের সূচনা হয়েছে, আমরা তার মধ্যবর্তী interglacial period-এ অবস্থান করছি; কারণ গ্রীনল্যান্ড, আন্টার্কটিকা এবং হিমালয় ইত্যাদি সুউচ্চ পর্বতমালায় এখনও হিমবাহ বিরাজ করছে।** এই তুষার যুগে শেষ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে ২০,০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীতে , বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ এবং ইউরেশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বরফে ঢেকে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে প্রধান প্রধান তুষার যুগ (আন্তঃতুষার যুগ সহ) দেখা গেছে তার ইতিহাস চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। [চিত্র ঃ ১০] (Lemon : Page 327, fig 12.22)

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ ৫টি প্রধান তুষার যুগ দেখা গেছে। এই যুগগুলির বাইরে অন্য সময় পৃথিবীর

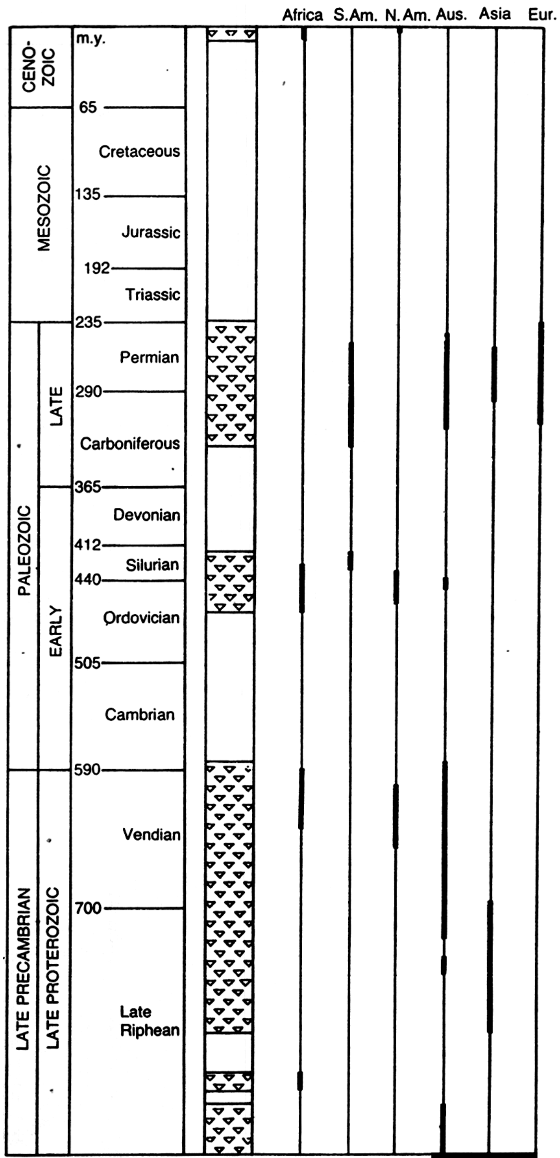

চিত্র ঃ ১০

গড় তাপমাত্রা ছিল অনেক বেশি এবং তখন সুউচ্চ পর্বত মালাগুলিও ছিল হিমবাহহীন এবং উষ্ণ।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তুষার যুগ দেখা যায় আজ থেকে ২৪০-২১০ কোটি বছর আগে **হিউরোনিয়ান যুগে**। সেই সময় হাজার হাজার কিমি ব্যাপী হিমবাহের উপস্থিতির ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় সেন্ট স্টে মারি থেকে সাদবারি, হিউরন লেকের উত্তর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃতির। উত্তর আমেরিকার মারকোয়েট, মিচিগান এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই হিমবাহগুলি ঢেকে রেখেছিল।

এর পরবর্তী তুষার যুগ হল **ক্রায়োজেনিয়ান তুষার যুগ** যা আজ থেকে ৮৫-৬৩ কোটি বছর আগে দেখা গিয়েছিল। এই সময় প্রায় সমগ্র পৃথিবী বরফে ঢেকে গিয়েছিল এবং নিরক্ষরেখা (ইকুয়েটর) অঞ্চল পর্যন্ত হিমবাহ বিস্তৃত ছিল। এই তুষার যুগের অবসানের পর পৃথিবী আবার উষ্ণ হয়ে ওঠে। সমুদ্রের গড় জলতল উপরে উঠে আসে-জীবকূলের বসবাসের পক্ষে পৃথিবী আবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, নতুন নতুন বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হতে থাকে। এই প্রাণীকূলকে **এড়িয়াকারা ফণা** বলা হয়। এর কিছুকাল পর অর্থাৎ আজ থেকে ৬০-৫৭ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের প্রাচুর্য দেখা যায় যাকে **ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশান** বলা যায়।

এর পরবর্তী তুষার যুগ হল **আন্দিজ-সাহারা তুষার যুগ**। এই তুষার যুগ ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং আজ থেকে ৪৬-৪৩ কোটি বছর আগে অর্থাৎ অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষকাল থেকে সিলুরিয়ান যুগ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তী ছিল।

এর পরবর্তী তুষারযুগ হল **কারু তুষার যুগ**। এই তুষার যুগ আজ থেকে ৩৫-২৬ কোটি বছর সময়কাল ব্যাপী ছিল অর্থাৎ কার্বনিফেরাস যুগের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে পারমিয়ান যুগের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত এর পর্যায়কাল ছিল। এই তুষার যুগের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ অস্ট্রেলিয়া, দঃ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থাৎ প্রাচীন অর্ধ Supercontinent Gondwana land জুড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দামোদর উপত্যকার কয়লাস্তরের নীচে এই বরফ যুগের উপস্থিতির বড় সড় প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই তুষার যুগের অবসানের পর পৃথিবী পুনরায় উষ্ণ হয়ে ওঠে, সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পায় অসংখ্য নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। মহাদেশীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্য এই সময়কালে ব্যাপক আকারে দেখা যায়, যা পরবর্তী সময় গন্ডোয়ানা কয়লার জন্ম দিয়েছে।

এর পরবর্তী এবং শেষ তুষারযুগের সূচনা হয় আজ থেকে ২৫ লক্ষ বছর আগে অর্থাৎ প্লায়োসিন যুগের একদম শেষভাগ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। এই তুষারযুগকে **প্লায়েস্টোসিন তুষারযুগ** বলা হয়। এই প্লায়েস্টোসিন তুষার যুগে গড়ে ৪০,০০০ থেকে ১ লক্ষ বছর অন্তর ছোট ছোট তুষার (Glacial) যুগ এবং আন্তঃতুষার যুগ (interglacial) দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা মহাদেশে এই তুষার যুগ এবং অন্তঃ তুষার যুগগুলি নিম্নরূপ।

- পোস্ট গ্লেসিয়াল (Post Glacial)
- উইসকনসিন গ্লেসিয়াল (Wisconsin Glacial)
- সাঙ্গামন ইন্টারগ্লেসিয়াল (Sangamon Interglacial)
- ইল্লিমিয়াল গ্লেসিয়াল (Illimial Glacial)
- ইয়ারমাউথ ইন্টারগ্লেসিয়াল (Yarmouth Interglacial)
- কানসান গ্লেসিয়াল (Kansan Glacial)
- অ্যাফটোনিয়ান ইন্টারগ্লেসিয়াল (Aftonian Interglacial)
- নেব্রাস্কান গ্লেসিয়াল (Nebraskan Glacial)

এইভাবে চারটি প্রধান ছোট তুষার যুগকেও আবার আরও ছোট ছোট তুষারযুগ এবং অন্তঃতুষারযুগে ভাগ করা যায়। যেমন শেষতম ছোট তুষারযুগ Wiscunsian আগের দুটি ছোট অতিক্ষুদ্র তুষার যুগ Riss এবং Wurm গুরুত্বপূর্ণ। এই প্লায়েস্টোসিন তুষার যুগ ইউরোপ, আন্টার্কটিকা, এশিয়ার একটি অংশ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেও তার প্রবল উপস্থিতির প্রমাণ রেখে গেছে। উত্তর আমেরিকার শেষ ক্ষুদ্র তুষার যুগ হল Wisconsian যা উত্তর ইউরোপে Weichsel নামে বিখ্যাত। এই প্লায়েস্টোসিন তুষারযুগে হিমালয় পর্বতমালা, সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভাগ তুষারে আবৃত হয়ে পড়েছিল। তরাই অঞ্চলের তৃণভূমিতে সেইসময় কয়েকশত প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণী পাওয়া যেত। মানুষের পূর্বপুরুষ এই প্লায়েস্টোসিন যুগেই আধুনিক মানুষে বিবর্তিত হয়েছিল। এইসময় হিমালয়ের পাদদেশে সঞ্চিত পলি থেকে শিবালিক পর্বতমালার জন্ম হয়। এই তুষারযুগে মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকা হিমবাহের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে গেছিল। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার প্রবল ঘাটতি সহ্য করতে না পেরে প্রচুর সংখ্যক মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণী বিলুপ্ত হয়। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে তথা শিবালিক পর্বতমালা অঞ্চলে বসবাসকারী অসংখ্য স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন জেব্রা, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, হরিণ, চিতাবাঘ ইত্যাদি শীতল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উত্তর ভারত থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে আফ্রিকা মহাদেশে (তুলনায় উষ্ণ ছিল) চলে যায়। পরবর্তীকালে উষ্ণতাবৃদ্ধির পর হিমালয় গলে গলে আফ্রিকা মহাদেশে এবং এশিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ওই সমস্ত প্রাণীরা তাদের আদি বাসস্থান ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে আর ফিরে

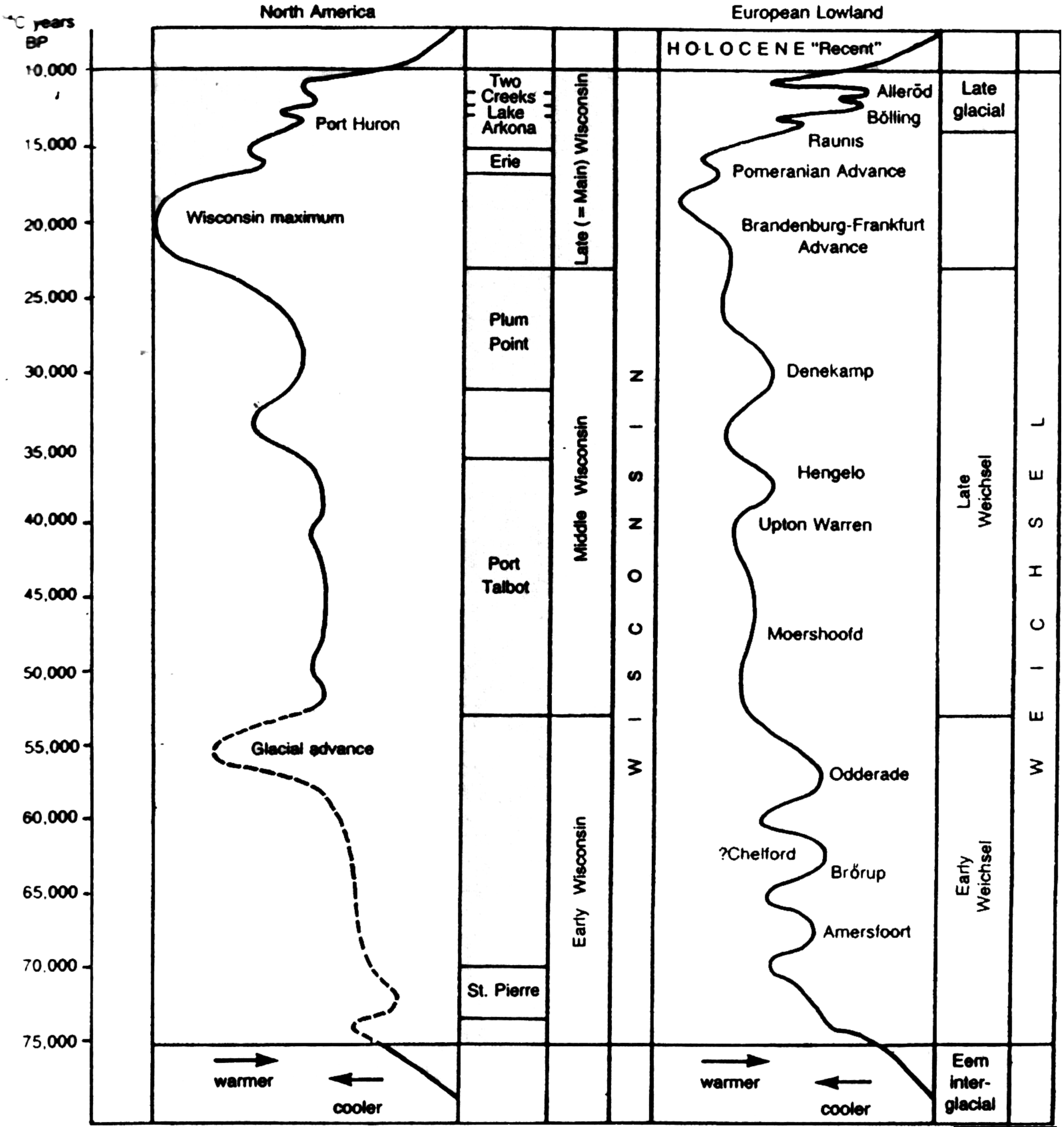

চিত্র ঃ ১১

Climatic fluctuation, ice advances, and recessions during the last glaciation.

আসতে পারে না।

শেষ তুষারযুগ উইসকনসিয়ান বা উইচসেল আমলে অর্থাৎ আজ থেকে ৭৫ হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের নীচু এলাকায় তাপমাত্রার পরিবর্তন, হিমবাহের আকার ও আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি উপরোক্ত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। [চিত্র ঃ ১১] (Lemon : page 433, fig. 15.22) পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও শীতলায়ান যে চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে উপরোক্ত গবেষণা তাকে

বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করছে। এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও কুলিং প্রকৃপক্ষে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আগে করা হয়েছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা যে চক্রাকারে বারে বারে উষ্ণ এবং শীতল হয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়ণের পর আবার বিশ্ব শীতলায়ন হয়েছে এর প্রমাণ কী ? অতীতে তুষার যুগের উপস্থিতি যে ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

তুষার বা বরফ যুগের অস্তিত্বের তিন ধরনের প্রমাণ আছে–

(১) পাললিক শিলা থেকে প্রমাণ – প্রথমতঃ তুষার যুগে বড় বড় হিমবাহ উপস্থিত থাকে, মহাদেশ ও সমুদ্রে (বর্তমানে যেমন আন্টার্কটিকা, উত্তর মহাসাগরে আছে)। এই হিমবাহের প্রবাহের জন্য যে পলিসঞ্চয় হয় সেই পলির কণাগুলির প্রকান্ড থেকে অতিক্ষুদ্র এইরূপ অসম আকৃতির হয়। বড় বড় প্রস্তরখন্ড বা বোল্ডার, নুড়ি ইত্যাদি কাদার সাথে পাওয়া যায়। এই পলি জমে যে পাললিক শিলা হয় তাকে বলে টিলাইট (Tillite)। এই টিলাইটের বোল্ডার বা নুড়িগুলির গায়ে বরফের ঘর্ষণজনিত দাগ পাওয়া যায়, নুড়ি বা বোল্ডারগুলি পাথরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে। এই টিলাইটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উপস্থিতি তুষার যুগের বড় প্রমাণ। এই টিলাইট ছাড়াও একপ্রকার পাললিক শিলা পাওয়া যায় যাকে বলে **ভার্ব** (Verb)। এই ভার্ব হল অতি মিহি দানা ও কাদার পর্যায়ক্রমিক স্তরবিশিষ্ট পাললিক শিলা, যা বরফ গলা নদী যা হ্রদে সৃষ্টি হয়। একটি বছরে দুটি স্তর সৃষ্টি হয় একটি ঠান্ডায় এবং একটি গরমে। এই ভার্ব হল তুষারজনিত কারণে সৃষ্ট একপ্রকার পাললিক শিলা যার বিশাল বিস্তৃতি তুষার যুগের উপস্থিতির প্রমাণ। তুষার যুগে সৃষ্ট পাললিক শিলা কখনওই লাল বা বাদামী বর্ণের হয় না। কারণ বাতাসে তাপমাত্রা ও জলীয় বাষ্প কম থাকায় লৌহকণার জারণক্রিয়া কমে যায়। তুষার যুগে সৃষ্ট পাথর বরং অনেক সময় হাল্কা সবুজ বর্ণের হয়। কারু তুষার যুগে সৃষ্ট গন্ডোয়ানাশ্রেণীর পাললিক শিলার একদম নীচের স্তরে আমরা এইরূপ টিলাইট, ভার্ব, ড্রপস্টোন, গ্রীন শেল পেয়েছি দামোদর, গোদাবরী, মহানদী প্রভৃতি উপত্যকায়।

(২) রাসায়নিক প্রমাণ ঃ ফসিল ও পাললিক শিলায় বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপের বিভিন্নতাকে জানার মাধ্যমে আমরা ওই ফসিল ও পাললিক শিলা সৃষ্টি হওয়ার সময়ে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন (শীতল না উষ্ণ) হিসাব করতে পারি, যেমন অক্সিজেন।

আমরা জানি যে অক্সিজেন মৌলের ৩টি আইসোটোপ আছে $০^{১৬}$ (সাধারণ অক্সিজেন), $০^{১৭}$ এবং $০^{১৮}$ এর মধ্যে $০^{১৭}$ পাওয়া যায় অত্যন্ত অল্পমাত্রায়। বাতাসের স্বাভাবিক অক্সিজেনে $০^{১৮}$ পাওয়া যায় ০.২%। যেহেতু এই আইসোটোপগুলির পারমাণবিক গুরুত্ব আলাদা আলাদা, তাই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই আইসোটোপগুলির সংযোজন ও বিয়োজন বিভিন্ন মাত্রায় হয়। কার্বনেট যৌগ বা কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টির সময় পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ওই যৌগে $০^{১৮}$ এর মাত্রা বেশি হয় যদি বিক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় হয় আর যৌগে $০^{১৬}$ এর মাত্রা বেশি থাকে যদি বিক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রায় ঘটে। পরীক্ষাগারে প্রস্তুত কার্বনেট যৌগ $০^{১৬}/০^{১৮}$ অনুপাত (প্রমাণ মাত্রার বিচারে) বিভিন্ন পাললিক শিলায় উপস্থিত কার্বোনেট খনিজ বা কার্বোনেটের আস্তরণে আবৃত জীবাশ্মের $০^{১৬}$ এবং $০^{১৮}$-এর অনুপাত হিসাব নেওয়া হয়। প্রমাণ মাত্রার (Standard) তুলনায় ওই জীবাশ্মের আবরণ (শেল) বা পাথরের কার্বোনেট মৌলের $০^{১৬}/০^{১৮}$ অনুপাত যদি কম হয় তবে বোঝা যায় যে ওই জীবাশ্ম বা শিলাটি তুলনায় শীতল জলবায়ুতে সৃষ্ট আর $০^{১৬}/০^{১৮}$ অনুপাত যদি বেশি হয় তবে বোঝা যায় যে জীবাশ্ম বা শিলাটি তুলনায় উষ্ণ জলবায়ুতে সৃষ্ট।

একটি সামুদ্রিক জীবাশ্ম ফোরামিনিফেরা (Globigerina saculifera)-র শেল (কার্বোনেট জাতীয় বহিঃআবরণ)-কে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী এমিলিয়ানি প্রথম অতীত দিনের পরিবেশের তাপমাত্রা নির্ধারণের প্রয়াস নেন। বিভিন্ন পাললিক শিলাস্তরে প্রাপ্ত Globigerina saculifera-র বহিঃআবরণের কার্বোনেট যৌগের $০^{১৬}/০^{১৮}$ অনুপাত নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানী এমিলিয়ানি প্রথম খৃষ্টপূর্ব ৮ লক্ষ বছরে মেক্সিকো উপসাগরের তাপমাত্রার পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে ওই অঞ্চলে **বিগত প্রায় ৮ লক্ষ বছরে পরিবেশের তাপমাত্রায় অন্ততঃ ৯ বার উষ্ণায়ণ ও শীতলায়ন চক্রাকারে ফিরে ফিরে এসেছে।** বিজ্ঞানীরা এও প্রত্যক্ষ করেন যে তুষার যুগগুলিতে সমুদ্রের জলে অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাত ($০^{১৬}/০^{১৮}$) কমে গেছে, সমুদ্রতল নেমে গেছে এবং জলের লবণাক্ততা বেড়েছে আর উষ্ণযুগগুলিতে সমুদ্রের জলে $০^{১৬}/০^{১৮}$ বেড়েছে, সমুদ্রতল উঠে এসেছে এবং জলের লবণাক্ততা কমেছে। [চিত্র ঃ ১২] (Lemon : page 413, fig. 15.7)

(৩) জীবজগতের চক্রাকারে বিলোপ এবং বিকাশ থেকে পাওয়া প্রমাণ ঃ পরিবেশের তাপমাত্রার চক্রাকারে পরিবর্তনের জন্য উষ্ণ ও শীতল পরিবেশের পক্ষে উপযোগী প্রাণী ও উদ্ভিদের বিকাশ অথবা বিলোপ ঘটেছে। তুষারযুগে

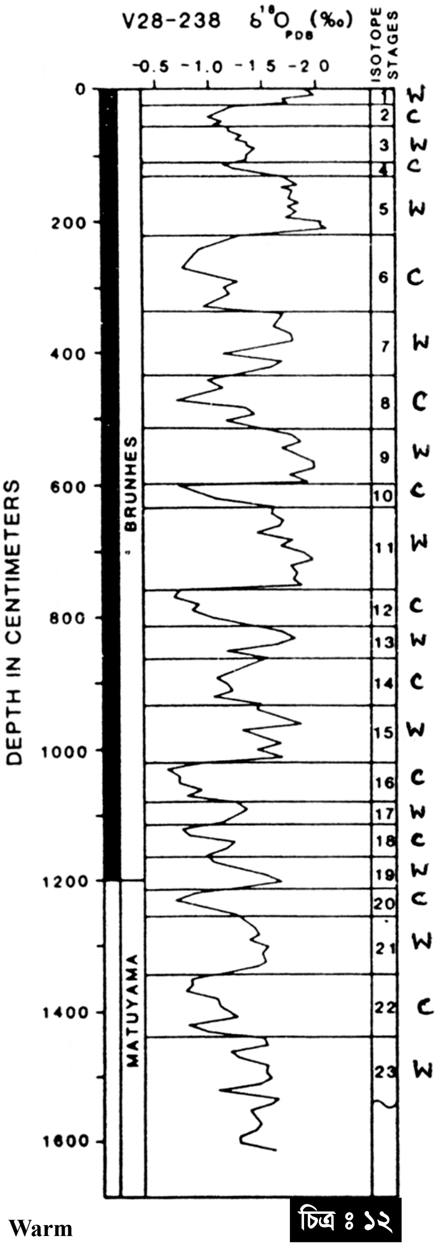

চিত্র ঃ ১২

W = Warm
C = Cold

Succession of oxygen isotope stage as determined in deep-sea core V28-238 from the equatorial Pacific (depth scale in cm), with age estimates for stage boundaries. (From Williams, D.F.1984, Correlation of Pleistocene marine sediments of the Gulf of Mexico and other basins using oxygen isotope stratigraphy, in Healy Williams, N., ed., Principles of Pleistocene stratigraphy applied to the Gulf of Mexico : Boston, Internat. Human Resources Devel. Corp.

সাধারণভাবে শীতল পরিবেশে বেঁচে থাকতে না পেরে অসংখ্য প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত (extinct) হয়ে গেছে অথবা অস্থায়ীভাবে বিলুপ্ত (exterminated) হয়ে গেছে। নীচের ছবিতে প্রাণীকূলের গণপ্রতি (per genus) বিলুপ্তির হার সময়ের সাথে সাথে কিভাবে চক্রাকারে কমেছে এবং বেড়েছে (পরিবেশ উষ্ণ ও শীতল হওয়ায়) তা তুলে ধরা হল। [চিত্র ঃ ১৩] (Lemon : page 101, fig. 4.13)

বিজ্ঞানী মিলানকোভিচের দেওয়া চক্র (Milankovitch Cycle) অনুসারে পৃথিবীর তাপমাত্রা যে পর্যায়ক্রমে ১ লক্ষ বছর, ৪১ হাজার বছর এবং ২৩ হাজার বছর অন্তর উষ্ণ ও শীতল হয়, অক্সিজেন আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানী হে (১৯৭৬) তা প্রথম প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী Wowe J.J.এবং বিজ্ঞানী Walker MJC (১৯৮৪) পুনরায় গবেষণা করে মিলানকোভিচ চক্রের সত্যতা প্রমাণ করেন। [চিত্র ঃ ১৪] (Lemon page 415, fig 15.8)

যাই হোক বিভিন্ন গবেষণা থেকে ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমিকভাবে ও চক্রাকারে পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও বিশ্ব শীতলায়ন চক্রাকারে ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কার্বনজাতীয় জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উষ্ণায়ণ হচ্ছে বলে বিগত ৩ দশক ধরে এত প্রচার হচ্ছে, অথচ ১৯৪০-৭০ পর্যায়ে পৃথিবীর শীতলায়ন হওয়ার কথা কেউ বলছেন না। এখন কার্বন ডাই আক্সাইড বাতাসে বেড়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে বলা হচ্ছে অথচ ১৯৪০-৭০-এ বলা হয়েছিল যে পরিবেশের দূষণের ফলে বায়ুমন্ডল গ্যাসের দ্বারা ঢেকে গিয়েছিল বলে সূর্য থেকে কম উত্তাপ পৃথিবীতে পৌঁছানোর জন্য সেই সময় শীতলায়ন হয়েছিল।

নাসার বিজ্ঞানীরা ১৮৮০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি রাষ্ট্রের তাপমাত্রা পরিবর্তনের চিত্র প্রকাশ করেছেন। সেই রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে [চিত্র ঃ ১৫] (U.S. National Surface Temperatue) যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বায়ুমন্ডল গত ২২৬ বছরে ক্রমান্বয়ে উষ্ণ ও শীতল হয়েছে। বিজ্ঞানী হে, মার্টিনসন, মরলে ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা বিগত ৮ লক্ষ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন যে চক্রাকারে উষ্ণ ও শীতল হয়েছে (মিলানকোভিচ চক্র) তা প্রমাণ করেছেন। [চিত্র ঃ ১৬]

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও জলবায়ু ব্যবস্থায়, পজিটিভ ফিডব্যাক ও নেগেটিভ ফিডব্যাক অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলবায়ু ব্যবস্থায় একটি ঘটনা ঘটলে, যদি জলবায়ু ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শর্তগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে মূল ঘটনাটি

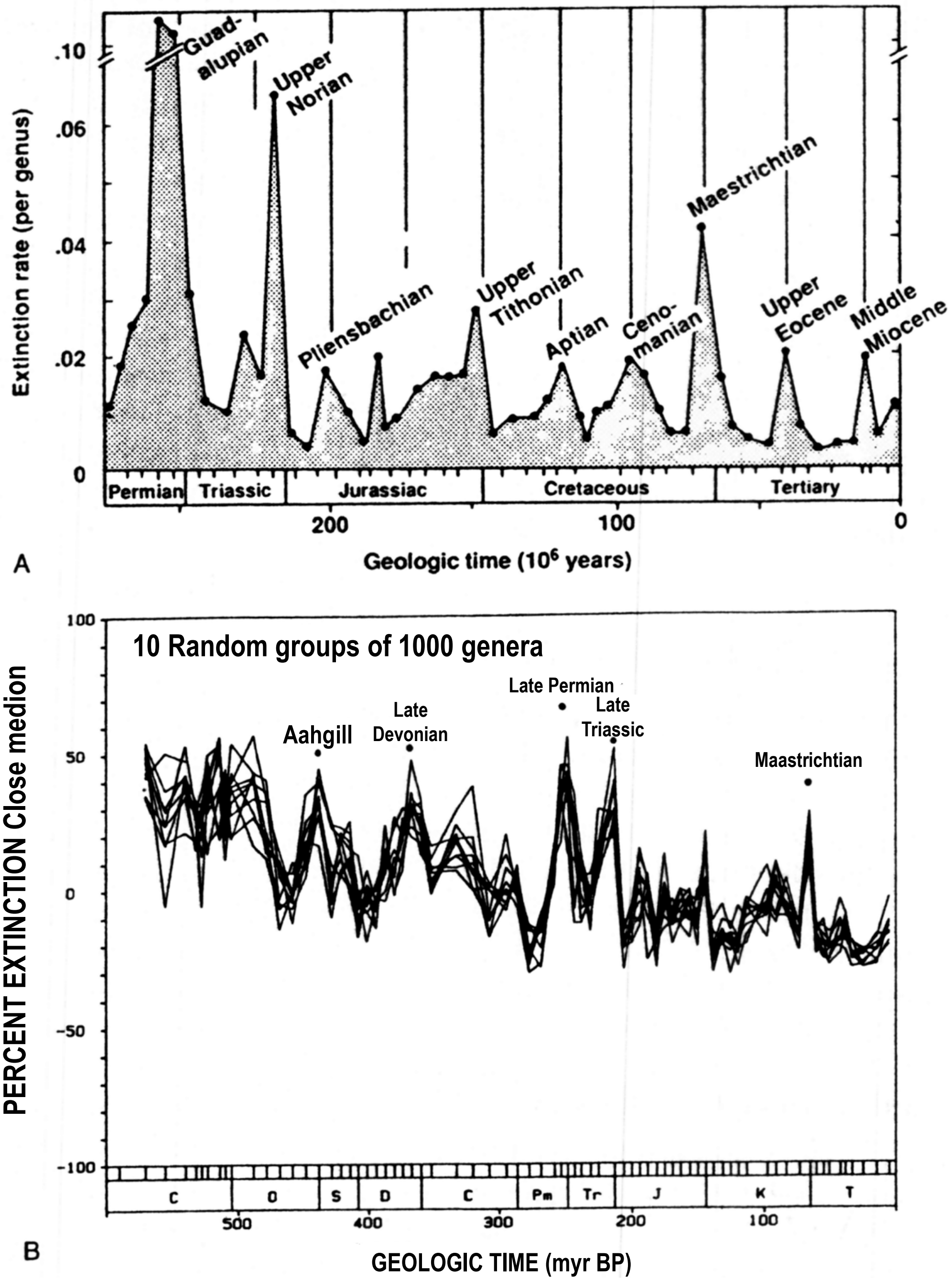

A record of percent extinction per million years from data sate of 9773 marine animals. The best fit 26 m.y cycle is shown along the top. Abscissa denote statigraphic stages. Dots indicates centre of sampling intervals (Raup D.M. and Sepkoski. J. J. jr. 1988).

চিত্র ঃ ১৩

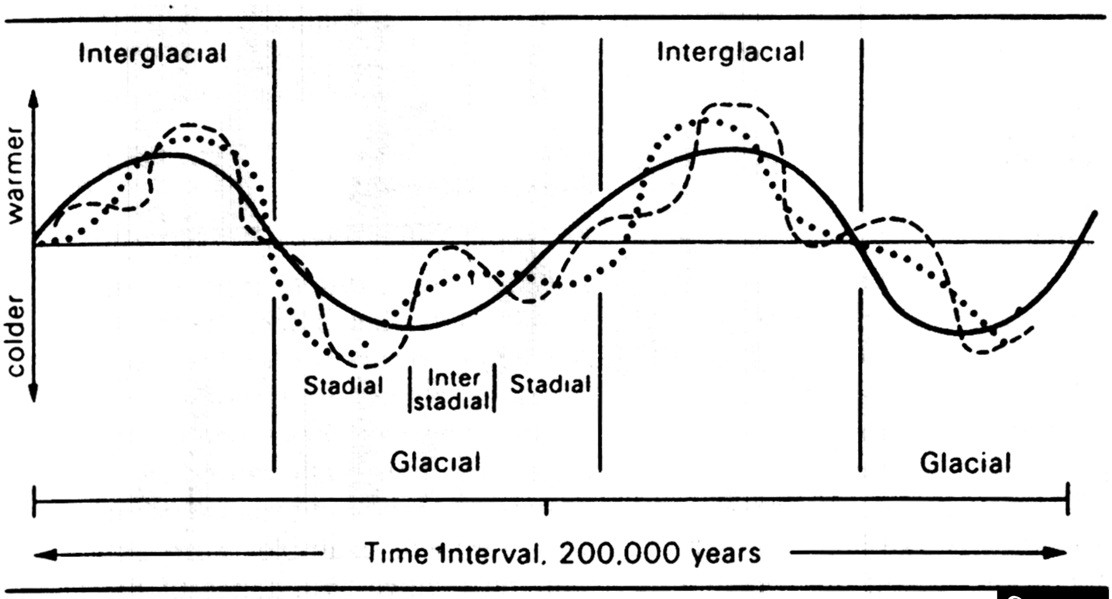

চিত্র ঃ ১৪

আরো বৃদ্ধি পায় তাকে পজিটিভ ফিডব্যাক বলা হয়। যেমন তুষার যুগে, Albedo বেড়ে যায়, ফলে তুষার যুগের ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। **এই কারণে তুষার যুগের স্থায়ীত্ব, উষ্ণযুগ অপেক্ষা অনেক বেশি।**

আবার যদি জলবায়ু ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শর্তগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে মূল ঘটনাটি হ্রাস পায়, তবে তাকে নেগেটিভ ফিডব্যাক বলা হয়। যেমন পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব কমে গেলে তুষার যুগের অবসান ঘটে। রিচার্ড এস. লিন্ডজেন-এর মতে

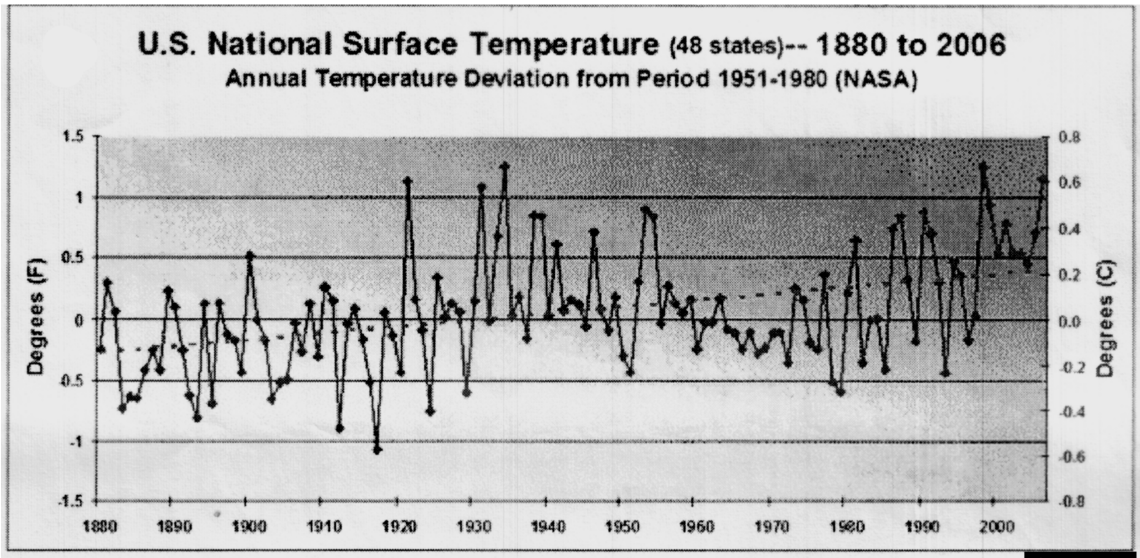

চিত্র ঃ ১৫

Temperature data inferred from measurements of the ratio of oxygen isotope ratios in fossil plankton that settled to the sea floor, and assumes that changes in global temperature approximately tracks changes in the global ice volume. Based on data from J. Imbrie, J.D.Hays, D.G. Martinson, A. Mclntyre, A.C. Mix, J.J. Morley, N.G. Pisias, W.L.Prell, and N.J. Shackleton, in A. Berger, J. Imbrie, J. Hats, G. Kukla, and B. Saltzman, eds., Milandovitch and Climate, Dorderecht, Reidel, pp. 296-305, 1984. Courtesy of Thomas Crowley, Remembrance of Things Past : Greenhouse Lessons from the Geologic Record

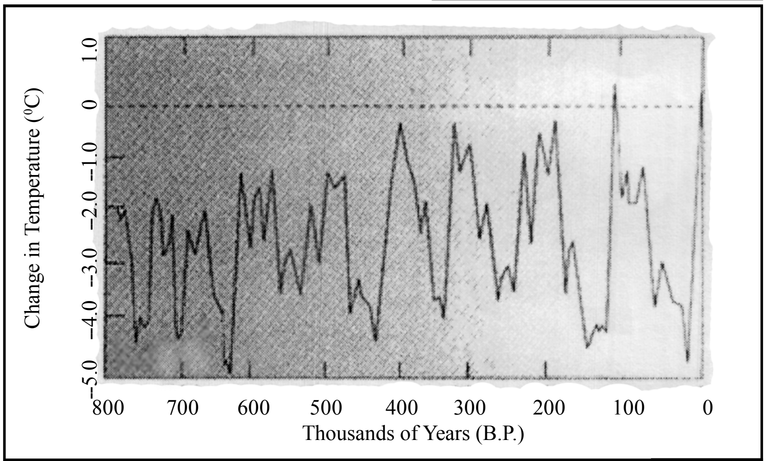

চিত্র ঃ ১৬

প্রকৃতিতে -ve feed back বেশি ঘটে। কিন্তু IPCC-এর বৈজ্ঞানিকদের মতে +ve feed back বেশি ঘটে।

প্রকৃতির সব নিয়ম কানুন আবিষ্কৃত না হওয়ায়, ফলাফল থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা গত আট লক্ষ বছরের প্রকৃতির ইতিহাস ঘেটে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা পর্যায় ক্রমিকভাবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমায় পৌছেছে। উষ্ণায়ন দ্রুত ঘটে এবং শীতলায়ন ধীর প্রক্রিয়ায় ঘটে। মূলত এই সব মহাজাগতিক কারণেই বারে বারে তুষার যুগ ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু কখনোই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তুষার যুগ বিরাজ করেনি। বর্তমানে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চল বরফ দ্বারা আবৃত অর্থাৎ দুই মেরুতে তুষারযুগ চলছে।

IPCC – বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও পরিবেশের প্রতিকূল পরিবর্তনের দায় সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, "Enthropogenic Warming" অর্থাৎ মানুষের ক্রিয়াকলাপ জনিত তাপবৃদ্ধির কথা বলে।

মিলানকোভিচ চক্র, সৌরকলঙ্ক, গ্রীন হাউস গ্যাস, প্লেট টেকটনিক সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য এবং তুষার যুগের ঐতিহাসিক চিহ্ন ও অস্তিত্ব জানার পরেও কি পাঠক বন্ধুরা বলবেন, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" অ্যানথ্রোপোজেনিক?

পৃথিবী উষ্ণ ও শীতল হওয়ার প্রত্যেকটি কারণ নিজ নিজ কার্যকারণ সম্পর্ক অনুযায়ী চক্রাকারে আবর্তিত হয়। একই সময় কোনো কোনো কারণ পৃথিবীকে উষ্ণ করে তো অপর কোন কোন কারণ শীতল করার চেষ্টা করে। এইসব কারণগুলির সমন্বয় সাধন যেভাবে ঘটে, পৃথিবীও সেইভাবে উষ্ণ ও শীতল হয়। তাই আট লক্ষ বছরের পৃথিবীর উষ্ণতার লেখচিত্র সরল রৈখিক হয়নি। দেখা গেছে দীর্ঘকালীন শীতল যুগের মধ্যে ছোটো ছোটো উষ্ণযুগ এবং দীর্ঘ্যকালীন উষ্ণযুগের মধ্যে ছোটো ছোটো শীতল যুগের অস্তিত্ব।

ভূ-বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। শুধু ভূ-বিজ্ঞানীরাই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে এ সত্য

*** ১৮২৪ খ্রী. বিজ্ঞানী যোসেফ ফুরিয়ে, ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বজায় থাকার কারণ রূপে বায়ুমন্ডলকে দায়ী করেন। তিনি সর্বপ্রথম গ্রীন হাউস কথাটি ব্যাখ্যা করেন।**

*** ১৮৫৯ খ্রী. বিজ্ঞানী টিন্ডাল কার্বন ডাই আক্সাইড ও জলীয় বাষ্পকে তাপধারক রূপে ব্যাখ্যা করেন।**

*** ১৮৯৬ খ্রী. বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, শিল্পীয় যুগে শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লার ব্যবহার বায়ুতে কার্বন ডাই আক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। যেহেতু CO_2 একটি তাপধারক পদার্থ, তাই পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মানুষের ভূমিকা আছে।**

*** সকল বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে একমত যে, গ্রীন হাউস এফেক্ট পৃথিবীকে ৩৩° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করেছে। অর্থাৎ গ্রীন হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হত -১৮° সেন্টিগ্রেড, সেক্ষেত্রে জীবের আবির্ভাবের সম্ভাবনাই কমে যেত।**

সন্দেহের অতীত।

এখন প্রশ্ন হল, এটা জানা সত্ত্বেও IPCC এবং পরিবেশবাদীরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-কে অ্যানথ্রোপোজেনিক বলছে কেন ?

প্রকৃতির সব নিয়ম-কানুন আবিস্কৃত না হলেও, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতি যে বাজার সর্বস্ব তা আবিস্কৃত ও প্রমাণিত। IPCC হল রাষ্ট্রসংঘের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সংস্থা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বুদ্ধিজীবীরা ও তাদের বক্তব্য শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়, বরঞ্চ শ্রেণী-স্বার্থকেই রক্ষা করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিটি চক্র সম্পূর্ণ হয় বাজারে। তাই নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য একদিকে আইন মারফৎ পণ্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, আর অন্যদিকে মূল কারণকে আড়াল করে প্রকৃতির বাহ্যিক প্রভাবকে সামনে তুলে এনে বাজার-এর পক্ষে জনমত গঠন করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই IPCC এবং তার ধারক ও বাহকরা “গ্লোবাল ওয়ার্মিং”-কে অ্যানথ্রোপোজেনিক বলে প্রচার করছে। আগামীতে, প্রয়োজনে, “গ্লোবাল কুলিং”-কে সামনে এনে নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা হতে পারে।■

● *ব্যাক কভারের শেষাংশ*

‘আন্তর্জাতিক রসায়নবর্ষ ২০১১’ কোন দৃষ্টিতে পালন করা উচিত

পক্ষ নিয়ে তাদের দলের সদস্য হন এবং ফ্রান্সে জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

আইনস্টাইন পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর বিরোধিতা করেন এবং রোমাঁ-রোলাঁর সঙ্গে পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ফ্রেডরিক জোলিও, আইরিন ক্যুরি, নিল্‌স বোর, ক্লাউস ফুক্স, ওপেন হাইমার, এনরিকো ফার্মি প্রমুখ বিজ্ঞানী পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে আইনস্টাইন কর্তৃক রচিত, **“হোয়াই সোসালিজম”** গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়, পারমাণবিক শক্তি থেকে শুরু করে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফলগুলি কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সকল মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। বিজ্ঞানের এই বিশাল উন্নতি আধুনিক অস্ত্র এবং নিউক্লিও শক্তির আবিষ্কার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সমাজে মানবসমাজকে বিপদের দিকে নিয়ে যাবে। একমাত্র সামাজিক মালিকানাধীন সমাজই মানব প্রগতি ঘটাতে পারে এবং ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, ১৯৫০-এ ফ্রেডরিক জোলিও ও আইরিন ক্যুরিকে, সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে নিজ নিজ পদ থেকে বহিঃষ্কৃত করা হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সমগ্র বিজ্ঞানের অংশ রূপে রসায়ন বিজ্ঞানও একচেটে পুঁজিপতিদের স্বার্থে বাজার দখলের লড়াইয়ে, পরমাণু বোমা থেকে মারণ গ্যাস (ফসজিন) উৎপাদন ও প্রয়োগে ব্যবহার হয়ে আসছে।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে – পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহারে জনবহুল শহর শ্মশানে পরিণত হয়েছে – হিরোসিমা-নাগাসাকিতে, হিটলারের গ্যাস চেম্বারে অথবা ভূপাল গ্যাসকান্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাসায়নিক পদার্থের শিকার হয়েছেন। কিন্তু শ্মশানকে শোষণ করা যায় না। তাই যারা বাজার দখলের লড়াইয়ে ক্ষিপ্ত তারা নতুন করে পরমাণু বোমা প্রয়োগের স্পর্ধা দেখাবে কী? বরঞ্চ বাজার সৃষ্টি ও চাঙ্গা রাখতে বিভিন্ন জীবাণুকে বাঁচিয়ে রেখে, তাদের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন ঘটিয়ে – সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ও হবে। ১৯৯৩-তে, গুজরাটের সুরাটে নিউমোনিক প্লেগের হঠাৎ আগমণ – তারই উদাহরণ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র রূপে মারণ গ্যাস (ফস্‌জিন) প্রয়োগ করবে। তাই মারণ গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। এই মারণ গ্যাসের মারণ মাত্রা পরীক্ষা করে নিরীহ মানুষের উপর তা প্রয়োগ করা হয়। ভূপালের গ্যাস কান্ড তারই প্রমাণ।

তাই আনুষ্ঠানিক দিনযাপন বা বর্ষপালন নয়, “আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ” পালন তখনই সার্থক হবে, যখন রসায়ন শাস্ত্র শুধুমাত্র মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করতে, রসায়নের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জনকল্যাণমুখী, প্রকল্পের পক্ষে এবং জনকল্যাণ বিরোধী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের শপথ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।■

শিশু-শ্রম ও শিশু-শ্রমিক কেন ?

– সংযুক্তা চক্রবর্তী

'ছোট ছোট দুটি পা ছোট দুই হাত
দু টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত।'

সকালবেলা ডাউন ক্যানিং কিংবা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে দেখবেন ছোট ছোট অসংখ্য শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এদের গায়ের রঙ কারও নীল, কারও সবুজ, কারও আবার বেগুনী। সোনারপুর স্টেশন পার হওয়ার পর দেখবেন ওই সব ঘুমন্ত শিশুদের অভিভাবকরা জোর করে এক একটা স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত সকালে রঙ মাখা শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় স্কুলের বদলে কোথায় যাচ্ছে?

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন-এর বাইরে বেড়িয়েই চোখে পড়বে ছোট্ট একটি ছেলে আর একটি মেয়ে স্টেশন-এর সিড়িতে বসে একটু খাবার চাইছে। জনে-জনে প্রত্যেকের জামা টেনে, কারো বা হাত ধরে আকুলভাবে একটু খাবার চাইছে। সবাই এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ বা তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে। মুখে বলছে সবই "অসাধু চক্র" ! কিন্তু কারুরই কি মনে হয় না এই "চক্র"গুলোতে কেনই বা এই ৪-৫ বছরের শিশুরা কাজ করছে? কোথায় তাদের শৈশব? শৈশবের সরলতা ?

শহরের সর্বত্র চোখে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ময়লা-আর্বজনা, আস্তকুড়েতে ফেলে দেওয়া পচা-খাবার চেটে-পুটে খাচ্ছে। অনেক মানুষের দয়া হয়। অনেকের রাগ হয়। অনেকে তাদের উপেক্ষা করে।

বর্তমান সমাজে শিশু ও শিশু-শ্রমের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর আলোচনা, সেমিনার, গবেষণা হয়। মাঝে মাঝে বলা হয় শিশুশ্রম একটি সামাজিক ব্যাধি। এটা রুখতে কঠোর আইন লাগু করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখে শুধু বললেই হয় না "শিশু-শ্রম বন্ধ করা উচিত" – পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে-এর সঠিক সমাধান খোঁজাটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিশু-শ্রমিক নিয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে

১. কৃষি সম্বন্ধীয় কাজে শিশু শ্রমিকের ব্যবহার ঃ

সর্বশেষ আই.এল.ও. রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৮০% শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করা হয় "কৃষি" ও "কৃষি সম্বন্ধীয়" কাজে। সাধারণত মহাজনের ধার শোধ না করার ফলে নিরুপায় অভিভাবকেরা তাদের শিশুদেরকেই এই মহাজনদের কাছে বিক্রি করে দেয়। ধান রোয়া বা কাটার সময় বাবা-মায়ের সাথে শিশু সন্তানরাও মাঠে কাজ করে।

২. ভিক্ষাবৃত্তি ঃ

অনেক শিশুকে দিয়েই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করানো হয়। বয়স-উপযোগী স্কুলে যাওয়ার বদলে তারা হাত পেতে ভিক্ষা করে বা তাদের দিয়ে লজেন্স, ফুল-এর মতন টুকি-টাকি জিনিস বিক্রি করানো হয়। তাদের অনেকের দিনের পর দিন কোন খাবার জোটেনা আবার কাউকে হয়তো জোর করে খেতে দেওয়া হয়নি যাতে তার ক্ষুধার জ্বালা দেখে সাধারণ মানুষের দয়া হয়।

৩. কাঁচ কারখানায় শিশু শ্রমিক ঃ

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে প্রায় ৬০,০০০ শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কাঁচ ও কাঁচের চুড়ি তৈরী করার কারখানায়। নগণ্য পারিশ্রমিক, অসহনীয় তাপ এবং চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এরা এদের শৈশবের দিনগুলিকে অতিবাহিত করে।

৪. দেশলাই কারখানায় শিশু-শ্রমিক ঃ

দেশে প্রায় ২০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৩৫% হল শিশু, যাদের বয়স ১৪ বছরের কম। ভোর চারটে থেকে শুরু করে দিনে ১২ ঘন্টার ও বেশি তারা কাজ করে চলে।

৫. অন্যান্য কল-কারখানায় শিশু-শ্রমিক ঃ

বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে এদেশে প্রায় ৫০,০০০-এর বেশি শিশু কাজ করে পিতল কারখানায় আর তালা তৈরীর কারখানায়। পশ্চিমবঙ্গের চম্পাহাটি, বলরামপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা), তামিলনাড়ুর শিবকাশীর মত এলাকায় হাজার হাজার শিশু শ্রমিক বাজি তৈরী করে এছাড়া বিড়ি তৈরী, প্লাস্টিক শিল্প, রঙ মেশানোর কাজ, মিষ্টি বা চায়ের দেকান প্রভৃতি ছোট বড় নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য শিশু

কাজ করে।

ভারত সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন শিশু-শ্রম বিরোধী আইন ঃ

1.The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1980. এই আইন অনুযায়ী তৈরী হয় National Policy of Child Labour (1987).

এই আইনের প্রকল্পগুলি হল ঃ

ক. Legistlative Action Plan : শিশু-শ্রমিক আইন সঠিকরূপে প্রয়োগের স্বার্থে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কঠোর প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ চালু করা যাতে শিশুদের বিপদসঙ্কুল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অথবা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিয়োগ রোধ করা যায়। এই আইন অনুযায়ী শিশুরা এমন কোন পরিস্থিতিতে বা পরিবেশে কাজ করবে না, যা তাদের শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবে।

খ. Focussing of General Developmental Programmes for Benifitting Child Labour : এই আইনের আওতায় বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী এই সব পরিবারের দারিদ্র উপশমের জন্য সরকার থেকে সঠিক পারিশ্রমিক যুক্ত কাজের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

গ. Project Based Plan of Action :

প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত কাজ শুরু করা হবে সেই সব অঞ্চলে যেখানে শিশু-শ্রমিকের হার সর্বাধিক। National Labour Project (NCCP) [1988]-এর উদ্যোগে দেশের নয়টি জেলা নির্বাচিত করা হয় যেখানে শিশু-শ্রমিকের হার সর্বাধিক।

ঘ. পরিকল্পিত প্রকল্পের সময় সীমার পরিশেষে শিশু-শ্রমিক হ্রাস করা ও বিপদসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু-শ্রমিক নিয়োগের অবসান ঘটানোকে মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করা হয়। (The Strategy for elimination of Child Labour under 10th Plan... Co-ordination with V.V. Giri National Labour Institute).

ঙ. পরিকল্পিত প্রকল্পকে উপরোক্ত নয়টি জেলা ছাড়াও দেশের আরও ১৫০টি জেলায় বৃদ্ধি করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়। (The Strategy for elimination of Child Labour under 10th Plan... Co-ordination with V.V. Giri National Labour Institute).

চ. ৫-৮ বছরের শিশুদের সরাসরি সর্বশিক্ষা অভিযানের আওয়ায় আনা NCCP Scheme-এর "Special School"-এ এর চেয়ে বেশি বয়সের শিশুদের শিক্ষা প্রদান এবং Vocational training দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।(The Strategy for Elimination of Child Labour under the 10th Plan... Co-ordination with V.V. Giri National Labour Institute 2001)

এত আইন প্রকল্প, প্রতিশ্রুতি কি আদৌ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে ? নাকি সরকার অনুমোদিত এই সকল আইন কেবল সাজানো ফলের ডালা হয়ে মানুষের সামনে এসেছে! সবচেয়ে বড় কথা, সরকারী আইন ও সমস্যা নিরসনের প্রকল্পগুলি শিশু শ্রম প্রথা বিলোপের লক্ষ্যে তৈরী নয়। বিপদসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার হাত থেকে রক্ষা করার কথা বলে, শিক্ষার সুযোগবৃদ্ধির কথা বলে রাষ্ট্র হাত ধুয়ে ফেলেছে। শিশু শ্রম প্রথার মত অমানবিক প্রথা সমাজে কেন টিঁকে আছে এবং প্রকৃপক্ষে এটা নির্মূলের পথ কী, তার কথা নেই।

অনেক সমাজ বিজ্ঞানী, গবেষক, মন্ত্রী, আমলা বলেন অশিক্ষাই নাকি শিশু শ্রম প্রথা টিঁকে থাকার একমাত্র কারণ। কিন্তু যেখানে দুবেলা দুমেঠো খাবার জোটেনা, মাথার উপর ছাদ নেই সেই সব পরিবারের কাছে শিক্ষা নিছকই এক বিলাসিতা নয় কী? স্বাভাবিকভাবেই তখন শিক্ষার থেকে বেশি দামী হয়ে ওঠে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। অভিভাবকরাও তাই পরিবারের শিশুকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়।

আজও ঘরে ঘরে শোনা যায় অভুক্ত শিশুর কান্না। এই শিশুদের শৈশব আনে না কোন সুখ-স্মৃতি। সবুজ মাঠে খেলা করা, গাছে চড়া, হুটো-পুটি, শৈশবের উদ্দাম-উল্লাস এদের জন্য নয়। ক্ষুধার জ্বালায় ফিকে হয়ে যায় এই সব কিছু। একটু খাবারের জন্য তার ছোট্ট-ছোট্ট হাত-পা, অপুষ্টিতে ভোগা, রোগাশীর্ণ-মলিন চেহারা নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে ওই মহাজনের কারখানায়। এই আইনের অনুমোদকরা দেখতে পায় না তার কচি গালে দুফোঁটা চোখের জল। কারখানার তাপে, ঘামে-চোখের জলে মিলেমিশে, ধুয়ে মুছে যায় তার শৈশব। এই ছোট্ট প্রাণগুলোতে নেই কোন আকাশ-কুসুম স্বপ্ন, শুধু আছে মহাজনের লাল চোখ-রাঙানি, লাম্বা-ঝাঁটা। নির্মম অত্যাচার ক্ষীণ করে দেয় তাদের জীবনী-শক্তি। অনেকেই কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়ার আগেই বুড়িয়ে যায়।

'এ মহাভারত দাদা　　এ মহাভারত
মাছের মতই আছে　　শিশুর আড়ত।
জ্বালানির মত আছে　　শিশুর যোগান
মহাভারতের কথা　　অমৃত সমান।' ■

প্রথম বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖নভেম্বর ২০১১

“সবই ব্যাদে আছে”

মেঘনাদ সাহা

[বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা এই রচনাটি লিখেছিলেন ‘ভারতবর্ষ’ ২৭বর্ষ পৃ ৪০৭, ফাল্গুন ১৩৪৬, ইং ১৯৪০। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মেঘনাদ রচনা সংকলন থেকে সংগ্রহ করে তা পুনরায় ছাপা হল। – সম্পাদক]

একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে লেখক বেদকে মনুষ্যপ্রণীত মনে করেন। যাঁহারা বেদকে ‘অপৌরুষেয়’ মনে করেন তাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত নয়।

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে “সবই ব্যাদে আছে” এইরূপ লিখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি ‘বেদের’ প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of Ionisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দু-এক মিনিটে পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, “এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।” আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন্ অংশে আছে অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি ?” তিনি বলিলেন, “আমি ত কখনও ‘ব্যাদ’ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই ‘ব্যাদে’ আছে।” অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে (বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পন্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপে কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পন্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যাবসায় প্রসূত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়েছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে ? কিন্তু এই সমস্ত “অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করী” শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপহ গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন না। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পন্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই

কিছুই নয়। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।)

এই শ্রেণীর লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ, সমালোচক অনিল বরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি 'বেদ' মূলে না হউক অনুবাদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অপজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি "সবই ব্যাদে আছে" এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কি আছে ?

এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ–আঠার বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলাবাহুল্য, বেদ বলিতে এস্থানে আমি ঋগ্বেদই বুঝিয়াছি। পরে ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদে "ঋগ্বেদসংহিতা" পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধ হয় মূল 'বৈদিক সংস্কৃতে' বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সায়নাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান (সায়নভাষ্য)। কিন্তু প্রধানত ইউরোপীয় পন্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অংশসমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারণ অনেক–একটি প্রধান কারণ* এই যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত হয় এবং যে সময়ে যে দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণীর লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের back ground না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তীদিগকে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, 'বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল ?' বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময়নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী পন্ডিতগণ সেই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের' সময়নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ, যাঁহার এককালে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটিকেই খৃস্টীয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতি মাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খৃঃ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খৃঃ অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে য়ুরোপীয় পন্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা 'যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০৪০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খৃঃ-পূঃ ৪২০০ অব্দ পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ২৭০০ অব্দে মিশরে পিরামিড্ ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খৃঃ-পূঃ ২৬০০ অব্দে ইরাক দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভবত খৃঃ-পূঃ ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ বেবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, 'বৈদিক সভ্যতা' এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদান প্রদান ছিল কিনা ? –বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫০

পূঃ-খৃঃ অব্দের মিটানীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজগণ আধুনিক মোসাল্ (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিসরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিটানীয়গণ ইরানিয়ান অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ–সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবৎ কাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালের তুর্কীদের বা মধ্যএশিয়াবাসীদের মত তাঁহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এথিমিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দরায়াবুস্) ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ ৫০০ পূঃ-খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অনুশাসন পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলকলিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে বিশেষত সীরিয়া দেশে প্রচলিত Aramaic লিপি। ১৪৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (Cuneform) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি (script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্জন করিয়াছে? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবীলিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হুন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীনলিপি, পারস্যে ফারসীলিপি এবং রুশিয়াতে Cyrillic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদীর উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই সভ্যতার সিন্ধুবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোন কোন উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়–যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলোন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে অথর্ব বেদ ১৫০০-১৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলোনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদ নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত ঋষিগণ কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি–প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীর সমষ্টি মাত্র। অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহণক্ষত্রাদি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শই সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা 'রা' দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Sirius তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমন্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাঁহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহণক্ষত্রাদিমূলক। যেমন–

An or Anu আকাশ বা দ্যৌ; Shamash বা Babbar –সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতা; Sin বা Nannar–চন্দ্র; Istar –সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা শনিগ্রহ; Nergal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিস্কৃত হইয়াছে এবং British Museum-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর গ্যাড্ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্টীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীও Egyptian Book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টড্ তাঁহার Dawn of Conscience in the World এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বাইবেল্ এ যে সমস্ত আধ্যাত্বিকতার বাণীকে যীশু খৃষ্টের মুখনিসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভাবত নয়, এমন কি, অক্ষরতও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ৪০০০ পূঃ-খৃঃ অব্দ হইতে ৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটি সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাঁহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় ধর্মের 'আধ্যাত্মিকতা'র ভিত্তি গঠন করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদী-পর্বতাত্মক 'দেবতা-সমূহ' নিস্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিযাছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহুদেবতার উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সময় (খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতা ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটি বা তিনটি বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয় পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের) লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই ২২০০ বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে (আনুমানিক বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; উপনিষদের 'আধ্যাত্মিকতা' ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ 'বেদকে' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাঁটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদ বিরোধী। যেমন ধরা যাউক, সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।"

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত মত অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাৎ পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন মতই বেদকে "অপৌরুষের ও অভ্রান্ত" প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারণ কি ? যাঁহারা বেদমত বিরোধী তাঁহারাও বেদের দোহাই দেন কেন ? একথার উত্তর একটি ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলামধর্ম–যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহম্মদ 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ। কিন্তু হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইসলাম জগতের অংশে বিভিন্ন কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা ওস্মান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইসলাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মোহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের একটি বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের

রচনাবলী বাস্তবিকই হজরতের মুখনিঃসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'কোরাণের' পান্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন এবং নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইসলাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইসলাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক !

কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইসলামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে ৭২টি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষের (অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের মুখনিঃসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, আচার, ব্যবহারে অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণসঙ্গত নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজাল সম্প্রদায় হইতে (যাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল্ প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন) আগা খানী সম্প্রদায় পর্যন্ত (যাঁহারা অবতার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান) সমস্ত পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন। তাহার কারণ, ইসলামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সীরিয়া, পারস্য, ইরাক, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি নানাদেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেকস্থলে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মদর্শনতত্ত্বজ্ঞ পন্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইসলামীয় ধর্মমতে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইসলামধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মতা সাহসও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণবিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণ করেন।

'বেদের অভ্রান্ততার' সম্বন্ধে ও এই বক্তব্য চলে। বৈদিক আর্যগণ যখন ২৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর-ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজ গণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন। পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত গণিৎ মন্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এ দিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণী ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অন্যপ্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকান্ডের প্রগাঢ় বিশ্বাসবান, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাহারা বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক 'শিব পশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকান্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেকস্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাঁহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকান্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কথা উঠিতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে সমস্ত জাগতিক তথ্য (world-phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিরূপে "বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির" ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা"র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'সমীক্ষণ'
পড়ুন ও পড়ান

হাসপাতাল

–সোমা শীল

হাতে একটা পুটুলি,
তাতে কটা বাসি রুটি সম্বল করে
অসুস্থ ছেলের হাত ধরে,
গ্রাম থেকে শহরের হাসপাতালে
এই প্রথম পা দিলাম।
একবার দু'নম্বরে, তারপর পাঁচে –
এমন করে ধাক্কা খেতে খেতে
অবশেষে ডাক্তারবাবুর সামনে পৌঁছলাম।
ছেলেকে দেখা নয় –
আমার সহায়-সম্বলের হিসেব নিলেন তিনি।
তারপর বললেন
"এ বড়ো কঠিন অসুখ, অপারেশন করতে হবে।
খরচা করতে পারবে তো ?"
"আজ্ঞে বাবু, গরীব মানুষ,
আমার তো পয়সাকড়ি নাই !"
"তবে আর কী ? নেতাদের ধর্না ধরো !"
সে আর এক চক্র –
সার্টিফিকেটে সই দেওয়ার আগে
নেতাকে জানাতে হবে আমি তার দলেরই লোক।
বোঝাতে হবে,
আমি বছরের পর বছর তাকেই ছাপ দিয়ে গেছি।"
সই যোগাড় হল –
এদিকে আমার দামাল ছেলেটা
ওষুধপত্র খাওয়ার পরেও দিন দিন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।
তারপর হাসপাতালের এমারজেন্সি থেকে
আমার ছেলের ঠাঁই হল
ওয়ার্ডের বারান্দায়, মেঝেতে।
হাসপাতালের এঁটো, নোংরা, পুষ্টিগুণযুক্ত খাবার খেয়ে
হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল, কুকুরের পাশে
আমার রুগ্ন ছেলে,
অনেক অপেক্ষার পরেও
ডাক্তার এলো না।
শুনলাম, এই রাউন্ডের পরে বিশ্রাম নিয়ে
উনি চলে যাবেন,
আজ আর দেখা মিলবে না !
ছুটে গিয়ে ডাক্তারের দু'পা জড়িয়ে
বললাম – "বাবু, আমি গরীব লোক।
বেশি পয়সার বেড কিনবার ক্ষমতা নেই।
এখানে কুকুর, বেড়ালেও খাবার পায়,
আর আমার ছেলেটা চিকিৎসা পাবে না !
আমার বাড়ি অনেক দূর,
একটা সই লাগবে বাবু,
বাড়ি যাবো।"
আমার শীর্ণ অসহায় ছেলেটা
তার দেহের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে
জাপটে ধরে বললো – "তুমি আমাকে এখানে
ফেলে যেওনা।
আমি বাড়ি যাবো, আমি মার কাছে যাবো"
সেদিন শুক্রবার। সই আর টাকা যোগাড় করে
সোমবার অপারেশন হল –
ছেলের আর বাড়ি ফেরা হল না।
ঘন্টাখানেক আটকে রেখে ডাক্তার ছাড়পত্র দিল।
আমার সব আশা-ভরসার কাঠগুলি একে একে সাজিয়ে
তার চিতা গড়লাম।
শেষবারের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে
মনে হল যেন কোন পাথরে খোদাই মূর্তি, ঘুমিয়ে আছে।
চুলগুলি এখনও হাওয়ায় নড়ছে।
পাড়ার বদ্যি জিজ্ঞেস করলো
"ছেলের তো মাথার অপারেশন,
তবে চুল আছে কেন" ?
এরপর সেই নিষ্পাপ মৃতদেহ নিয়ে
কাটাছেঁড়া হল –
জানা গেল, মাথার অপারেশন করাই হয়নি,
বদলে ছেলেটার দুটো কিডনিই বের করে নিয়েছে !
আমিও ঐ ডাক্তারের কলিজা বের করে নিয়েছি,
শাস্তির পরোয়া করি না।
কিন্তু এখনও তো
আমার মতো অসহায় বাবারা তাদের সন্তানদের নিয়ে
সুচিকিৎসার আশায় হাসপাতালে আসে;
পীড়িত সন্তান চিৎকার করে বলে –
বাবা, আমি বাড়ি যাবো !

ধারাবাহিক রচনা

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান

(প্রাচীন যুগ) – (২)

কোনো বস্তুই অপরিবর্তনীয় বা স্থির নয়, নিরন্তর বদলাতে থাকে। মানুষ ও তার সমাজও তার সমস্ত উপাদান, অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞানসহ বদলাতে থাকে। এই পরিবর্তনের ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাস। পরিবর্তন এক বা একাধিক কারণে হতে পারে। বস্তুর পরিবর্তন দু'প্রকারের – ভৌত অবস্থাগত পরিবর্তন এবং রাসায়নিক পরিবর্তন বা বস্তুর অন্তর্গঠনের পরিবর্তন। ভৌত অবস্থাগত পরিবর্তনে বাহ্যিক অবস্থা বদলায় মাত্র, অন্তঃধর্মের পরিবর্তন হয় না। রাসায়নিক পরিবর্তনে বস্তুর অন্তর্গঠন ও অন্তঃধর্ম বদলে যায়। সব থেকে সোজা উদাহরণটি হল ঃ বরফকে তাপ দিলে জল ও জলকে তাপ দিলে বাষ্প হয়। এই পরিবর্তন হল ভৌত অবস্থাগত পরিবর্তন, কারণ বরফ, জল ও বাষ্প আসলে একই বস্তু "হাইড্রোজেন মনোক্সাইড" (H_2O) – কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় রূপে বিরাজমান। এই পরিবর্তনের কারণ হল তাপশক্তি। আবার, জলে, পোড়াচুন (CaO) ফেললে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং কলিচুন $Ca(OH)_2$ উৎপন্ন হয় বা পোড়াচুনের অন্তর্গঠন বদলে দেয়; এটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

বিজ্ঞান মানব সমাজের গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগে উৎপাদনের উপকরণগুলি বিকশিত হয়েছে, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে বিজ্ঞান উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে, উৎপাদনের ধরন বদলেছে এবং সমাজে নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমভাগে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে আদিম মানুষের সংগ্রাম। এই লড়াইয়ে মানুষ বস্তু ও শক্তিকে জীবনের অনুকূলে ব্যবহার করা শিখেছে এবং তার সাহায্যে উন্নততর জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় ভাগে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়ার ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ প্রকৃতিকে (বস্তু ও শক্তিকে) স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

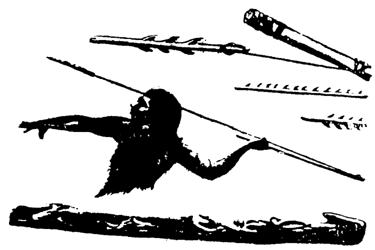

বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে - তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত। মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক সময়ে মানুষের যে বিশেষ ধর্ম বিকাশের প্রধান শর্ত হিসাবে কাজ করে তা হল কৌতূহলী মননশীলতা, বস্তু ও ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ, ধারণা অর্জন ও প্রয়োগ। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় প্রয়োগই তখন মূল বিষয় ছিল। সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত তত্ত্ব তখন সম্ভব ছিল না। বস্তু ও শক্তির ব্যবহার করতে করতে নিয়ম, নিয়ম থেকে সূত্র ও তত্ত্ব এসেছে। যেমন, আগে বর্ষপঞ্জিকা বা জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব আবিষ্কার করে মানুষ চাষ-বাস করেনি, চাষ-বাস শুরু করে তার নিয়মরীতি থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরী হয়েছে পঞ্জিকা।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রবেশের আগে বিজ্ঞান তথা মানব বিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাক। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক বিকাশ কোনো কোম্পানীর বেতনভুক্ত গবেষকদের হাত ধরে হয়নি, অথবা আবিষ্কারগুলি কেন্দ্রীভূত হয়নি কোনো বিশেষ শ্রেণীর হাতে। প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবশক্তি ও তার চেতনা – এই সম্পদের হাত ধরে আদিম অবস্থা থেকে মানুষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। এখন আমরা সেই ইতিহাসটাই দেখবো।

প্রাগৈতিহাসিক সময় – পুরাতন প্রস্তরযুগে দলবদ্ধ আদিম মানুষের একমাত্র উপজীবিকা ছিল খাদ্য সংগ্রহ – শিকার করা, ফলমূল আহরণ। এই কাজের জন্য মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে শিকারের উপযোগী পাথরের হাতিয়ার তৈরী করার মধ্য দিয়ে। পুরাতন প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়ের কয়েক লক্ষ বছর ধরে, আদিম মানুষ এইভাবে চলেছে এবং

হতে পারে, শিকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জন্তু জানোয়ারের বিষয়ে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণের ফলে প্রাণিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ মানুষের শুরু হয়েছিল। এর পরের ধাপ ছিল আগুন আবিষ্কার (আনুমানিক ৫০,০০০ বছর আগে)। আগুনের সাথে আদিম মানুষের পরিচয় অনেকদিনের, কিন্তু সে পরিচয় ছিল ভয়ের, যেমন অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার আগুনকে ভয় পায়। কিন্তু আদিম মানুষ ধীরে ধীরে আগুনের উপকারী দিক অনুধাবন করতে পারে এবং আগুনকে ব্যবহার করা শিখল। এই আবিষ্কার মানব সভ্যতার প্রথম বিপ্লব যার মধ্য দিয়ে মানুষ এক শক্তিকে ব্যবহার করতে শিখল এবং পশুত্ব থেকে উত্তরণের লক্ষণ দেখতে পেল। আগুনের ব্যবহার তাকে নিরাপত্তা দিল, আত্মবিশ্বাস বাড়ালো। এর সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কার্যকরী যন্ত্রের উদ্ভাবন শুরু হল, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের হাড় ও দাঁতের ব্যবহারও শুরু হল। বানানো হত নানান তীক্ষ্ণযন্ত্র, তীর, কাঠ-পাথর প্রভৃতিতে ছিদ্র তৈরী করার ড্রিল। ক্রমে এই মানবগোষ্ঠী তীর-ধনুক ও বর্শা নিক্ষেপ করা শিখল। হার্পুন, বর্শা প্রভৃতির ব্যবহার শিখল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই যুগের মানুষ, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শিকারীর জীবনমাত্র অতিবাহিত করেছে এবং খাদ্য সংগ্রহ করে গেছে। পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষভাগে আদিম মানুষ তার চিন্তা-ভাবনার ছাপ রেখে গেছে গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে জন্তু-জানোয়ারের ছবি এঁকে। এই অসাধারণ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভবিষ্যৎ মানব বিকাশের সুস্পষ্ট আলোকরেখা।

এরপর নতুন প্রস্তর যুগে সভ্যতা বিকাশের প্রথম বৈপ্লবিক ঘটনাটি ঘটে, মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের অবস্থা থেকে খাদ্য-উৎপাদকের ভূমিকায় উন্নীত হয়। কৃষিকার্য এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার সাথে পশুপালন, স্থায়ী বসবাসের স্থান নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম/সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য মজুত করা, মৃৎপাত্র নির্মাণ, বয়নকাজ এবং গৃহ-নির্মাণ এই যুগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই সময় ঘটে, তা হল গোষ্ঠীর মধ্যে জাতের বিভাজন ও বিনিময় ব্যবস্থা। যেমন, কিছু মানুষ মাটির পাত্র বানাতে পটু হয়ে উঠল, একদল লোক পশুর লোমের সাহায্যে বয়নবিদ্যা আয়ত্ত্ব করলো, আর একদল শিকারের হাতিয়ার বানাতে দক্ষ হয়ে পড়লো এবং একে অন্যের সাথে খাদ্যদ্রব্য, মৃৎপাত্র, পোশাক, শিকারের অস্ত্র বিনিময় করতে লাগলো। কৃষি ও পশুপালনের সাহায্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে মানুষ অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেবার সময় পেল। মানুষের জীবনযাত্রায় এ এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে এই পরিবর্তনের সূচনা এবং ছয় হাজার বছর আগে নব প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি পূর্ণ বিকশিত।

নব প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে মানুষ বাঁচতো। তাদের সংখ্যা, উৎপাদন সবই সীমিত ছিল। এর এক হাজার বছর পরের ইতিহাস রীতিমতো চমকপ্রদ। খ্রী.পূ. ৩০০০ অব্দের সমসময়ে নীল নদের উপত্যকায় মিশরিয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সুমের ও আক্কাদ সভ্যতা এবং সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা নগর সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু তার

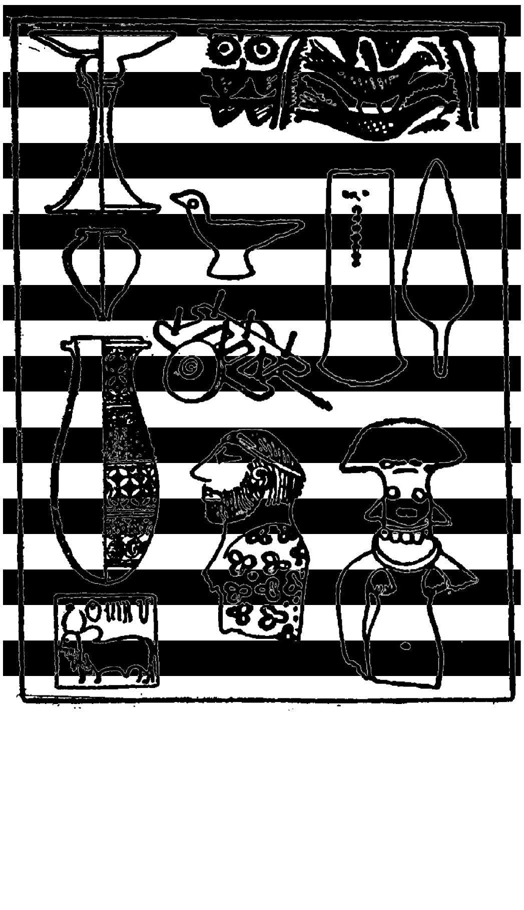

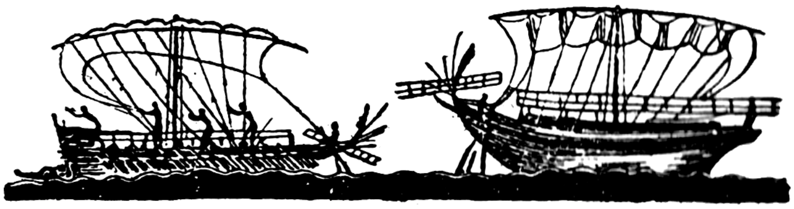

আগে মানুষ শিখেছে ধাতুর ব্যবহার।

প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে স্বর্ণের অবস্থান এবং তার ঔজ্জ্বল্যের জন্য এই ধাতুর প্রতি নব প্রস্তরযুগের মানুষের আকর্ষণ ছিল। ক্রমে মানুষ ধাতু বিদ্যা আয়ত্ত করে; তামা, ব্রোঞ্জ ও পিতলের ব্যবহার শেখে। অবশেষে লোহার ব্যবহার সভ্যতা বিকাশের জোরাল ভিত্তি তৈরী করে দেয়। কিন্তু ধাতু বিদ্যার কাজ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে খনিজ নির্বাচন, ধাতু নিস্কাষণ, বিশোধন, গলন, মিশ্রণ, ঢালাই এবং শেষে যন্ত্র নির্মাণ – এতগুলি ধাপের প্রতিটিই মানুষ অর্জন করেছে। যে মানুষ কৃষিকাজে বা শিকারে ব্যস্ত থাকে, তার পক্ষে ধাতু বিদ্যা আহরণে সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই কাজের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একদল মানুষ, যারা সরাসরি খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহে যুক্ত নয়, তারা নিযুক্ত হল। কৃষি ও পশু পালনে নিযুক্ত মানুষ ধাতু শিল্পিদের সামাজিকভাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতো। খ্রী.পূ. ৩০০০ অব্দ নাগাদ ধাতু শিল্প তার নিজের আকার প্রাপ্ত হয়।

আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার হল কাঁচ। কোথায়, কবে কাঁচ আবিস্কৃত হয়েছিল তা অজ্ঞাত। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে কাঁচ উৎপন্ন হতে পারে এবং তা কৌতূহলী, অনিসন্ধিৎসু মানুষের নজর আসার পরে, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বালি ও সোডাঘটিত মৃত্তিকার মিশ্রণে অগ্নিসংযোগের দ্বারা কাঁচ উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গে চাকার ব্যবহার, পশুশক্তির ব্যবহার, নৌকা বা জলযানের ব্যবহার, মানুষকে পরিবহণের কাজে সাহায্য করলো। এক একটি জিনিস তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটিকে আরও উন্নত ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। পায়ে পায়ে আদিম মানুষ সভ্যতার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

আগেই বলেছি বস্তুর সংগে ক্রমাগত প্রত্যক্ষ সংযোগ ধারাবাহিকভাবে চেতনার বিকাশ ঘটায়, রণে ভঙ্গ দিলে এই বিকাশ সম্ভব নয়। পদার্থ নিয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির ব্যবহার বিজ্ঞানকে সাবালক করে তোলে। এই জ্ঞান অর্জন, প্রকৃতি ও তার শক্তিকে অবাধ ব্যবহারের সুযোগ এবং বিনিময় প্রথা যতদিন সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে, ততদিন মানুষ শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়নি। কোনো মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান, ক্ষমতা ও দক্ষতা সমাজকে প্রদান করে অন্যের অর্জিত জ্ঞান ও ক্ষমতা-দক্ষতার ফল ভোগ করতে পারতো। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, উৎপাদনের পদ্ধতিগত বিকাশ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এর পরবর্তী সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছ। যে মানুষ শ্রম দিয়ে বস্তুর আকার ও ধর্ম বদলে জীবনের অনুকূল এনেছে, সে পরিণত হয়ে উঠেছে দাসে। দাসেদের হাত ধরে পূর্বতন সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই উৎপাদনের উপর কোন অধিকার ছিল না দাসেদের, সব কিছুই কুক্ষিগত থেকে যায় দাসমালিকদের হাতে। এইভাবেই সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের সূচনা হয়েছে।

নব্য প্রস্তরযুগের পরে আনুমানিক খ্রী.পূ. ৩০০০ অব্দের সম সময়ে সিন্ধু সভ্যতা (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো), নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় মিশরিয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সুমের ও আক্কাদ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এইসব সভ্যতায় প্রাসাদ, পিরামিড, শষ্যশালা, কারখানা, ধাতবপাত্র ও অলংকার, যুদ্ধাস্ত্র, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "লিপি" আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ধরনের সমাজে পরিচালক আর আদিম সমাজের গোষ্ঠীপতি নয়, তার স্থলে আসে রাজবংশ, শাসন পরিচালনারত রাজকর্মচারী, পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো বা সুমের ছিল বড়ো বড়ো জনপদ।

সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রথম ঐতিহাসিক প্রকাশ গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ ও মহাচীনে। কৃষি প্রধান সভ্যতা ও অর্থনীতির জন্য ঋতু পরিবর্তনের হিসাব রাখা, এবং তার জন্য গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা, সেচকার্যে গাণিতিক ও জ্যামিতিক ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এই সভ্যতাগুলিতে স্পষ্ট। গণিতশাস্ত্র এবং সংখ্যাতত্ত্বের উন্নতি এই সঙ্গে হয়েছিল। সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে বৈদিক

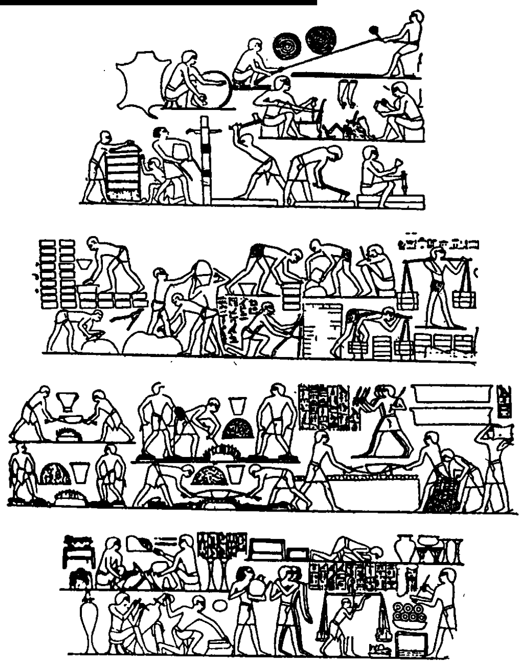

যুগ এক অতুলনীয় অবদান রেখেছিল। খ্রী.পূ. ২৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে এই সভ্যতা বিরাজ করেছে। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র (অথর্ববেদে বর্ণিত), শারীরবিদ্যা বৈদিক যুগের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। পরবর্তীকালে চিকিৎসা বিদ্যা পৃথকভাবে "আয়ুর্বেদ" নামে আত্মপ্রকাশ করে। মন্ত্র ও স্তোত্রের মাধ্যমে শারীরস্থান (anatomy), শারীরবিদ্যা (physiology), চিকিৎসাবিদ্যা (medical science), ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বর্ণিত হত। বহুদিনের গবেষণার রূপ হল আয়ুর্বেদশাস্ত্র। ঐতিহাসিকভাবে আত্রেয় ও সুশ্রুত (খ্রী.পূ. ৬০০ অব্দ) – এই দুজনকে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়। এর পরের উল্লেখযোগ্য নাম হল জীবক ও চরক। সুশ্রুত চরকের শল্যবিদ্যা বৈদিক যুগের চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হয়।

গণিত, জ্যোতিষ, প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিদ্যায় প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, মহাচীন ও ভারত তাদের নিজস্ব ধারায় চলেছে এবং মৌলিক আবিষ্কার করেছে। "লিপি" প্রণয়ন, দশমিক বা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে গণনা, পঞ্জিকা তৈরী, শল্য বিদ্যার উৎপত্তি ও বিকাশসাধন – এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের স্তম্ভগুলি নির্মিত হয়। এরপরেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে একটা ছেদ পড়ে; বিশেষ করে ব্যাবি লন, ও মিশর আরও বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু কেন?(ক্রমশঃ)

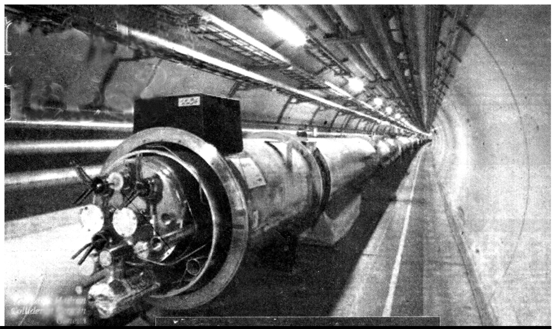

লার্জ হাইড্রন কোলাইডার

সার্ন-এর 'নিউট্রিনো' সংক্রান্ত গবেষণা

সার্নের বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হিসাবে জানিয়েছেন যে নিউট্রিনো ভূগর্ভে ৭৩০ কিমি পাড়ি দিয়েছে আলোক রশ্মি-র চেয়ে ৬০ ন্যানো সেকেন্ড কম সময়ে। জেনিভার কাছে ভূগর্ভস্থ গবেষণাগার 'সার্ন' থেকে ছোঁড়া অসংখ্য 'নিউট্রিনো' সবকিছু ভেদ করে পৌঁছে গিয়েছে ৭৩০ কিমি দূরবর্তী ইতালির গ্রানসাসো পাহাড়ের অন্য এক গবেষণাগারে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই নিউট্রিনোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০৬,০০০ মিটার, যা আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী।

এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মিডিয়া লিখেছে "প্রশ্নের মুখে আইনস্টাইন", আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে ইত্যাদি।

বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-সহ সমস্ত বিজ্ঞানী এখনই সংবাদপত্রের এই ধরণের মন্তব্যের সাথে সুর মেলাতে রাজী নন। হকিং বলেছেন "এখনও মন্তব্য করার সময় আসেনি, আর পরীক্ষা ও পর্যালোচনা দরকার।"

এই সংবাদ প্রকাশের পর অনেকেই বলছেন যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করা যায় না। আজ এককথা বলে, প্রমাণ করে, পরে আবার অন্য কথা বলে, অন্য কিছু প্রমাণ করে।

একথা মাথায় রাখতে হবে, বিজ্ঞান কোনও স্থবির বস্তু নয় – সে গতিশীল। এই গতিশীলতাও আপেক্ষিক। পুরাতন আবিষ্কার ভুল প্রমাণিত হলেও তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লঘু হয় না। সে নতুন উচ্চ পর্যায়ের আবিষ্কারের জন্মদাতা হয়ে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারে এবং মানবকল্যাণে তার ব্যবহারে মানুষ আরও এগিয়ে যায়। 'গেল গেল' রব তাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে বিচলিত করে না।

রিপোর্ট

TASAM ও FAMA আয়োজিত আলোচনা সভা

গত ২৬শে জুলাই একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (FAMA) এবং শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের সংগঠন (TASAM) এর পক্ষ থেকে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় কলকাতায়। আলোচনা সভার মূল শ্লোগান ছিল "বীজ বাঁচাও - জল বাঁচাও-দেশ বাঁচাও"। এই সংগঠনদ্বয় যে দাবিগুলি তোলে তার প্রধান তিনটি দাবি হল–

(১) দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার ভারত-মার্কিন কৃষি চুক্তি AKI বাতিল কর।

(২) জিন বদলানো ফসল চাষ নিষিদ্ধ কর।

(৩) খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ বন্ধ কর।

আলোচনায় দেশের জল-জমি-জঙ্গল দখলের জন্য বহুজাতিক পুঁজির একচেটিয়া আগ্রাসনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন যে প্রথম 'সবুজ বিপ্লব'-এর নামে পাঞ্জাব-হরিয়াণা-উত্তর প্রদেশকে 'মৃত্যু উপত্যকা' বানানো হয়েছে। এখন চুক্তির মাধ্যমে দেশের শস্য শ্যামলা পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে। এরই পোষাকী নাম 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'। জিন পরিবর্তিত ফসল-এর (প্রাণীদেহে) কুফল আড়াল করা হচ্ছে, চিরাচরিত বীজ বৈচিত্র্য ধ্বংস করে কৃষকদের স্বাধীন চিন্তা বন্ধক রেখে বহুজাতিক সংস্থার হাতে সার, বীজ, কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে।

সমগ্র আলোচনায় সরকারী নীতির সমালোচনা করে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা, যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ পেশ করা হয়নি। যার ফলে সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বাস্তব শর্ত, বিজ্ঞান মনস্ক মন, যুক্তি কোনটাই সুস্পষ্ট হয়নি। এই সংগঠনদ্বয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সম্বন্ধে কি মতামত তাও স্পষ্ট হয়নি। আলোচনা শুনে অনেকেরই মনে হয়েছে যে উদ্যোক্তারা মনে করেন–প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা, পুরানো সমাজ ভাল ছিল এবং সেটাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে। এছাড়া বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলিকে নিছক এক বহিঃশত্রু হিসাবে দেখানো হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন সমগ্র বিশ্বই যে সাম্রাজ্যবাদ তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীন, তা এই আলোচনা থেকে উপলব্ধ হয় না। একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার পুঁজিপুনরুৎপাদক প্রক্রিয়া জারী রাখার জন্য এবং অতিমুনাফার জন্য বিশ্বজুড়ে নিজস্বার্থে উৎপাদন জারী রাখে। সমস্যাগুলিকে এর পরিণতি হিসাবে না দেখলে সমস্যার উৎসকে চিহ্নিত করা ভুল হবে।■

লোকপাল বিল নিয়ে 'প্রগতিশীল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র'-র আলোচনা সভা

"অরাজনৈতিক মোড়কে দুর্নীতি দমনের নামে জনলোকপাল বিল নিয়ে আন্দোলন নাগরিক সমাজে সাড়া জাগালেও এর চরিত্র তথাকথিত আন্দোলনগুলির সাথে অভিন্ন" – এমনই একটি সারবত্তা উঠে এসেছে দঃ চব্বিশ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে 'প্রগতিশীল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' আয়োজিত 'লোকপাল' নিয়ে আলোচনা সভায়, গত ২৮শে আগষ্ট।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী কিংবা উচ্চ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি ফৌজদারী মামলা করা যায় না, অভিযোগ আনতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রধানের অনুমতি দরকার। ফলে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির সুযোগ খোলা থাকে। সরকারই এজন্য লোকপাল বিলের খসড়া করেছিল। কিন্তু বার বার বিষয়টা উত্থাপন করা সত্ত্বেও তা কার্যকরী হয়নি। রাজ্যস্তরে লোকায়ুক্ত কার্যকর হয়েছে কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজ্যে। যা দুর্নীতি দমনে প্রায় কোন ভূমিকা রাখতেই পারেনি।

আলোচনাচক্রে 'বিজ্ঞানমনস্ক'-কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের বক্তারা বক্তব্য রাখেন। বলা হয় "বিগত দিনে 'ভোপাল গণহত্যা' বিষয়ের মত জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে প্রচারের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বিজ্ঞানমনস্ক-কে সমালোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল বিজ্ঞান সংগঠনের সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় ভূমিকা রাখা অনুচিত। আমরা আমাদের লক্ষ্য পথে শত সমালোচনা সত্ত্বেও অবিচল থেকেছি। আজ অন্য বিজ্ঞান সংগঠনগুলির দ্বারা এই প্রয়াস দেখে বিজ্ঞানমনস্ক আপ্লুত ও আশাবাদী।" মূল আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় "১৯৬০ সাল থেকে সংসদে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য লোকপাল ধরনের সংস্থা গঠনের দাবি ওঠে। আজও তা কার্যকরী হয়নি। কমনওয়েলথ গেমস্, দু-জি স্পেক্ট্রাম কেলেঙ্কারী,

বিচারপতিদের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি জনসমক্ষে উঠে আসায় কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার যখন নাজেহাল তখনই আন্না হাজারের নেতৃত্বে লোকপাল বিল সংসদে পেশ করার দাবি ওঠে। বলা হয় – সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিই লোকপাল সংস্থার প্রতিনিধিদের ঠিক করবে। এই লোকপালের অধীনেই গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-কে রাখতে হবে, লোকপালকেই শাস্তি বিধানের অনুমতি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীসহ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের বিচারপতিদেরও লোকপালের আওতায় আনতে হবে, সাংসদদের সংসদে আচরণকে লোকপালের আওতায় আনতে হবে ইত্যাদি। আন্না টীম তাদের লোকপাল গঠনের প্রস্তাবকে জনলোকপাল নাম দিয়ে তার পক্ষে প্রচার করে।

সরকার এই দাবি না মানায় শুরু হয় আন্নার অনশন। চলতে থাকে দু-পক্ষের তর্ক-বিতর্ক। অনশন স্থলে ভিড় জমতে থাকে, মিডিয়া ২৪ ঘন্টা ধরে তার প্রচার তুঙ্গে নিয়ে যায়। অবশেষে বহু নাটকের পর দু-পক্ষের সমঝোতা হয়। আন্না টীমের মূল দাবি উপেক্ষা করে তিন পয়েন্ট সমঝোতা হয়–১) নীচুতলার আমলাদেরও লোকপালের আওতায় আনা হবে। ২) রাজ্যে রাজ্যে লোকায়ুক্ত গঠন করা হবে, ৩) সরকারী দপ্তরগুলিতে জন অভিযোগের সনদ গ্রহণ করা হবে।

এই আন্দোলনে এনজিও কর্মী, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ সামিল হলেও শ্রমজীবী জনতা সামিল হয়নি কারণ তারা জানে এই সমাজে 'পয়সা যার আইন তার'। বিজ্ঞানমনস্ক-র পক্ষ থেকে পরিশেষে বলা হয় যে সরকার এবং আন্না টীম উভয়ই মন্ত্রী-আমলা-বিচারপতিদের 'অসাধারণ' নাগরিকের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকদের এবং মন্ত্রী-আমলা-বিচারপতিদের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকবে কেন? মন্ত্রী-আমলাদের জন্য আইনী সেফগার্ড থাকলে আম জনতার জন্য তা থাকবেনা কেন ? সাধারণ মানুষকে আগে ধরো, জেলে পোড়ো কিংবা সন্ত্রাসী সন্দেহে গুলি চালাও - এরূপ কালা কানুন বাতিল করে সকলের জন্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হোক।'

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি-র পক্ষ থেকে বলা হয় "আগে যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনা যেত না, লোকপালের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধেও কিছুটা অভিযোগ আনা যাবে, এটা কিছুটা হলেও পাওয়া।"

অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ-র পক্ষ থেকে বলা হয় "সাংবিধানিক সম অধিকারের কথা - বাইরের একটা মলম, যা ঢেকে রাখে উচ্চপদস্থদের গা বাঁচানোর জন্য প্রণীত বিভিন্ন বৈষম্যমূলক সংবিধানের ধারা-উপধারার ক্ষতকে। লোকপাল - জনলোকপাল সবই ভাঁওতাবাজি, নাটক। এইসব নাটক আসল সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে দেয়। মানুষ যাতে দুর্নীতি ও তার উৎসের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য এই প্রহসন। সাধারণ মানুষের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।"

চেতনা বিজ্ঞান বার্তা'-র পক্ষ থেকে বক্তা দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। লোকপাল নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হল – লোকপাল নিয়ে আলোড়নের নেপথ্যে চলছে বিভিন্ন মহলের ক্ষমতা দখলের লড়াই। ইউপিএ সরকারেও রয়েছে একাধিক লবি। বিজেপি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে আগামী নির্বাচনকে মাথায় রেখে। আন্না টীমও চাইছে ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা। দুর্নীতি নিয়ে জনতার সেন্টিমেন্টকে তারাও কাজে লাগাচ্ছে। লোকপাল নিয়ে আলোড়ন থেকে পাওয়া একটাই, তা হল – "প্রধানমন্ত্রী ভগবান স্থানীয়, তার আবার বিচার কী ?" জনতার মধ্যে এই বিশ্বাসটা টলতে শুরু করেছে।

উক্ত বক্তার বক্তব্যের কিছু অংশ সভায় বিতর্ক সৃষ্টি করে। যে যে প্রশ্নে বিতর্ক উত্থাপিত হয় তা হল –

১) তিনি মন্তব্য করেন যে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি সবই ইউরোপ থেকে ধার করা। প্রযুক্তি তাই গণচরিত্র হারিয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ নয়, গান্ধী নির্দেশিত গ্রাম স্বরাজ ও প্রাচীন ভারতীয় স্বনির্ভর গ্রামীণ জীবন ও কুটীর শিল্পের প্রতি তিনি জোর দেন।

২) পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান সংগঠনগুলির গুপ্ত বা হিডেন অ্যাজেন্ডা হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচার করা। ধর্মীয় কুসংস্কারের মতই এই মতবাদগুলিও মানুষকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'আমার একটা বাড়ি চাই, গাড়ি চাই' এর বাইরে মার্কসবাদীরা যেতে পারেনি। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা এটাই দেখায়। এটাকেই সমাজতন্ত্র বলে প্রচার করা হয়।

এই দুটি বিতর্কিত বিষয় আমাদের বক্তব্য হল ১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলো যেখানেই জ্বলুক না কেন তাকে মুক্ত মনে গ্রহণ করা উচিত। কারণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে কোন দেশের সীমায় আটকে রাখা যায় না। প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও তার বন্টন ব্যবস্থাই সমাজে অসাম্য সৃষ্টি করেছে; গরীবের ঘরে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছায়নি - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকলের জন্য হয়নি মুনাফাখোড়ী ব্যবস্থার জন্য। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানীরা এর জন্য দায়ী নয়। প্রাচীন ভারতের গ্রামগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল - এই কথার বাস্তবতা কী ? সেখানে কি সব

মানুষের সমানতা ছিল ? সেখানে কি মানুষ কুসংস্কার মুক্ত ছিল ? আজকের তুলনায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে ছিল ? বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার শিল্প সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলো দেখলেই স্পষ্ট হয় যে ভারতের মত অনুন্নত দেশের অগ্রগতিতে ভারী শিল্প কতটা জরুরী।

২) বক্তা পশ্চিমবঙ্গের একটি বিজ্ঞান সংগঠন তথা পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর মতামত সভায় রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যই প্রমাণ করছে, যে বক্তব্যটি সর্বাঙ্গীণ সত্য নয়। কারণ তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার মনে করেন। তাছাড়া কোন বিজ্ঞান বা সামাজিক সংগঠন বা ব্যক্তি যদি কোন তত্ত্ব ও মতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী মনে করে এবং তার প্রচার করে তবে আপত্তি ওঠার কারণ কী ? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্ম ভারতে না হয়ে ইউরোপে হয়েছে বলে ? এটা কোন ধরনের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় ? আর পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে গাড়ি চাই, বাড়ি চাই দাবী উঠেছিল এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজ পরিচালিত হত এমন তথ্য তিনি পেলেন কোথায় ? আজ পর্যন্ত দুনিয়াজুড়ে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটাতেই এমন উদ্ভট তথ্য হাজির হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লেও আমরা সম্পূর্ণ উল্টো ছবি পাই।

এই সংক্ষিপ্ত সভায় অনেক দিক নিয়ে আরও বিশদে আলোচনার অবকাশ হয়নি, যা পরবর্তীতে করা যেতেই পারে। আবার যে আলোচনা হয়েছে তার সবটা এই স্বল্প পরিসরে বলা গেল না। তবে নানা তথ্য, পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সবাই একই সিদ্ধান্তে আসে ও একই দাবিতে সোচ্চার হয় – "লোকপালের প্রহসন আর নয়। রাষ্ট্রনেতা, প্রধানমন্ত্রী, সাংসদ, বিচারপতি, আমলা সকলে পদাধিকার নির্বিচারে একই বিচার ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" পাশাপাশি একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় –"দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনগুলি সাধারণ দাবিসমূহের ভিত্তিতে একটি সাধারণ মঞ্চ গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হবে।"■

ত্রিপুরায় 'ত্রিপুরা যুক্তিবাদ ও বিকাশ মঞ্চ-এর গণধর্ণা ও বিক্ষোভ মিছিল

গত ৩রা জুলাই তারিখে ত্রিপুরার স্টেট জেনারেল হাসপাতাল জি.বি.-তে চিকিৎসাধীন সমজান আলীর মৃত্যু হয়। সমজান আলীকে এক বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর পর তাকে প্রথমে 'ইন্দিরা গাঁধী মেমোরিয়াল' হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু অ্যান্টি স্নেক ভেনাম না থাকায় ওনাকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও অ্যান্টি স্নেক ভেনাম না থাকায় সমজান আলীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই করুণ রূপ ও দৈন্যদশার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ ও ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অরগানাইজেশন-এর পক্ষ ১৫ই সেপ্টেম্বর যৌথ আহ্বানে স্বাস্থ্য বিষয়ক ১২ দফা দাবিতে শহরের আর.এম.এস. চৌমুহনীতে এক গণধর্ণা ও তার অব্যহতি পূর্বে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। এই দাবীতে এখনও লাগাতার আন্দোলন চলছে।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র উদ্যোগে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঃ সেমিনারের বিষয় ঃ
"আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১"

৬ই নভেম্বর ২০১১ (রবিবার),
সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউট হল, রেল কোয়ার্টার পার্ক, সোনারপুর
দুপুর ২.৩০ মি. থেকে রাত্রি ৮.৩০ মি.

অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ ★তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা
★রসায়নের মজা (Fun with chemistry)
★সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক

অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

ধারাবাহিক

মানুষের বংশগত রোগ, প্রতিকার ও চিকিৎসা

পঞ্চানন মন্ডল

মানুষের জেনেটিক গঠন, বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং বংশগত রোগ সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহল বহুদিনের। কিন্তু মানুষের জিন গবেষণা করা খুব জটিল কাজ। তবুও নানা গবেষণা থেকে মানুষের বংশগতি, বংশগত রোগ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা গেছে। বিংশ শতাব্দির প্রথমে স্যার আরচিবাল্ড গ্যারেভের গবেষণা থেকে মানুষের জিনগত নানা ক্রুটি বিচ্যুতির কথা জানা যায় ও জিনের মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলি সম্বন্ধে ধারণা তৈরী হয়। যেমন অ্যালক্যাপ্টন ইউরিয়া রোগ, যাতে হোমোজেনেটিক অ্যাসিড ইউরিয়াতে পরিবর্তিত হতে পারে না, তা জন্মগত জৈব রাসায়নিক ক্রুটির কারণে হয়। এই জৈব রাসায়নিক ধাপটি একটি উৎসেচক দ্বারা প্রভাবিত এবং এই উৎসেচকের উৎপাদন বিশেষ জিন নিয়ন্ত্রণ করে। এই জিনে কোনো ক্রুটি দেখা দিলে এই বংশগত রোগ হয়। বেশিরভাগ বংশগত রোগ কেবল একটি জিনের মিউটেশনের ফলে হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী টি.এইচ. টিজো এবং লিভান যখন মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা (2n=46) নির্দিষ্টভাবে গুণতে সক্ষম হলেন তখন ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত ও আকৃতিগত পরিবর্তন ও সেই জন্য যে বিভিন্ন প্রকার বংশগত রোগ হতে পারে তার ধারণা বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্পষ্ট হল।

বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন জিনগত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা গেলেও, মানুষের উপর সে ধরনের পরীক্ষা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে জনন একান্তভাবে তার নিজস্ব ব্যাপার, তা কখনই গবেষকদের মর্জিমাফিক সম্ভব নয়। এছাড়া মানুষের পরিবার এতই ছোট যে বাহ্যিক গুণাবলির ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মানুষের জীবদ্দশা এতই বড় যে **কয়েকজনু** পরীক্ষা করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই মানুষের বংশগত পরীক্ষার প্রধান পদ্ধতি হল বংশতালিকা বিশ্লেষণ (Predigree Analysis)।

মানুষের ক্রোমোজোম–মানুষের প্রতিটি কোষে সঠিক ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n=46) জানার পর বিজ্ঞানীগণ দেখেন যে 46টি ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম (দেহজ বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ক্রোমোজোম) ও বাকি এক জোড়া (পুরুষের XY, মহিলাদের XX) হল সেক্স ক্রোমোজোম (লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম)।

মানুষের জিনগত ফ্যাক্টরের প্রভাবে সৃষ্ট রোগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. একটি জিনে মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট রোগ ২. ক্রোমোজোমের মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট রোগ, ৩. জেনেটিক ও পরিবেশের বহু ফ্যাক্টরের প্রভাবে সৃষ্ট রোগ।

একক জিন মিউটেশন ও তা সৃষ্ট রোগ – বহু বংশগত রোগ আছে যা একটি মাত্র জিনের মিউটেশনের ফলে সৃষ্টি হয়, এই জিনগুলি প্রকট (Dominant) বা প্রচ্ছন্ন (Reccessive) হতে পারে। এই জিনগুলি আবার অটোজোমবাহিত বা সেক্স ক্রোমোজোম বাহিত হতে পারে।

অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন মিউটেশন–এরকম প্রচ্ছন্ন মিউটেশন বাহ্যিকভাবে আপাত স্বাভাবিক (হেটারোজাইগাস বা বাহক) মা-বাবার সন্তানে দেখা যেতে পারে। ইহা স্ত্রী ও পুরুষে সাধারণত সমান সংখ্যায় দেখা যায়। যে সব অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বিরল সে সব ক্ষেত্রে ওইসব মিউটেশনযুক্ত

লোকের মা-বাবা আপাতভাবে স্বাভাবিক (কিন্তু হেটোরোজাইগাস বা বাহক), যেহেতু নিকট সম্পর্কযুক্ত মানুষের একই রকম মিউটেশন হেটোরোজাইগাস অবস্থায় থাকতে পারে সেজন্য এই প্রকার জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের বা নিকট সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ের অস্বাভাবিক সন্তান জন্মলাভ করতে পারে।

প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গে যদি হোমোজাইগাস স্বাভাবিক পুরুষ বা স্ত্রীর বিবাহ হয় তবে তাঁদের সন্তানের এই অস্বাভাবিকতা দেখা যাবে না, তবে এরা যদি ওই জিনের বাহক হয়, যদি এই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য যুক্ত একজন ও জিনের ক্ষেত্রে হেটোরোজাইগাস (বাহক) কাউকে বিয়ে করেন তবে তাদের অর্ধেক সন্তান ওই অস্বাভাবিকতা বিশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। মা ও বাবা দুজনেই প্রচ্ছন্ন জিনটির হেটোরোজাইগাস অবস্থায় থাকলে এদের $^{১}/_{৪}$ অংশ কন্যা বা পুত্র সন্তান হোমোজাইগাস ও অস্বাভাবিক হবে।

অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন জিনের মিউটেশনের জন্য সৃষ্ট প্রধান রোগগুলি হল – থ্যালাসেমিয়া, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, অ্যালক্যাপ্টইউরিয়া, অ্যালবিনিজম, কিটোনিউরিয়া, টাইরোসিনোসিস, টাইরো সিনোমিয়া, সিস্টিনিউরিয়া, টাইরোসিনেমিয়া, জেনেটিক গয়ট্রাস ক্রেটিনিজম, গ্যালাকটোসেমিয়া, সিস্টিক ফ্রাইক্রোসিম ইত্যাদি।

থ্যালাসেমিয়া ঃ ইহা একটি অটোজোম বাহিত জিনের প্রচ্ছন্ন অসুস্থতা। গ্রিক শব্দ থ্যালাস (Thalass)-এর অর্থ সমুদ্র। ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত অঞ্চলে এই রোগ প্রথমে খুব বেশি দেখা গিয়েছিল। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় বর্তমানে ভারতে প্রায় তিন কোটি লোকের শরীরে থ্যালাসেমিয়া জিন আছে। প্রতিবছর প্রায় দশ হাজার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু জন্মাচ্ছে। পিতা ও মাতার কাছ থেকে সন্তানরা এই রোগের একটি করে মোট দুটি রোগবাহিত জিন গ্রহণ করে নিজেরা রোগ-গ্রস্থ হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা এই রোগে আক্রান্ত না হয়েও রোগ বহন করেন, এদের বলা হয় বাহক। তাদের দেহে এই রোগের লক্ষণ না থাকলেও তারা নিজের সন্তানদের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ২০% মানুষ এই রোগের বাহক। ও সারা ভারতে বাহকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটির উপর।

থ্যালাসেমিয়া রোগের প্রধান কারণ লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকভাবে তৈরী না হওয়া। ফলে রক্তের O_2 ও CO_2 পরিবহণ ব্যাহত হয়। ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন যুক্ত লোহিত রক্ত কণিকা তাদের স্বাভাবিক কাজ (১২০ দিন) পূর্ণ করার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা যায়। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিন হল $-\alpha_2, \beta_2$ [দুটি α চেন ও দুটি β চেন]

১. পিতা ♂ x মাতা ♀ থ্যালাসেমিয়া মেজর $\beta^+\beta^+$ x থ্যালাসেমিয়া মাইনর $\beta^+\beta^+$ সমস্ত শিশু থ্যালাসেমিয়া মেজর (১০০%)	**২. পিতা ♂ x মাতা ♀** থ্যালাসেমিয়া মেজর $\beta^+\beta^+$ x স্বাভাবিক $\beta\beta$ সমস্ত শিশু থ্যালাসেমিয়া মাইনর (১০০%) $\beta^+\beta^+$
৩. পিতা ♂ x মাতা ♀ থ্যালাসেমিয়া বাহক $\beta^+\beta^+$ x থ্যালাসেমিয়া বাহক $\beta^+\beta$ ২৫% থ্যালাসেমিয়া মেজর শিশু ($\beta^+\beta^+$) ৫০% থ্যালাসেমিয়া মাইনর ($\beta^+\beta$) ২৫% স্বাভাবিক ($\beta\beta$)	**৪. পিতা ♂ x মাতা ♀** থ্যালাসেমিয়া মেজর $\beta^+\beta^+$ x থ্যালাসেমিয়া বাহক $\beta^+\beta$ ৫০% শিশু থ্যালাসেমিয়া মেজর ($\beta^+\beta^+$) ৫০% শিশু থ্যালাসেমিয়া মাইনর ($\beta^+\beta$)
৫. পিতা ♂ x মাতা ♀ খ্যালাসেমিয়া বাহক $\beta^+\beta$ x স্বাভাবিক $\beta\beta$ ৫০% শিশু থ্যালাসেমিয়া মাইনর ($\beta^+\beta$) ৫০% শিশু স্বাভাবিক ($\beta\beta$)	**৬. পিতা ♂ x মাতা ♀** স্বাভাবিক $\beta\beta$ x বাহক $\beta^+\beta$ ৫০% শিশু থ্যালাসেমিয়া মাইনর ($\beta^+\beta$) ৫০% শিশু স্বাভাবিক ($\beta\beta$)

যদি α চেন গঠন ব্যাহত হয় বা কম থাকে তাকে α থ্যালাসেমিয়া বলে, যদি β চেন গঠন ব্যাহত হয় বা কম থাকে তাকে β থ্যালাসেমিয়া বলে। α থ্যালাসেমিয়া বিরল এবং খুব ভয়ঙ্কর নয়। β থ্যালাসেমিয়া খুবই ভয়ঙ্কর। আমরা β থ্যালাসেমিয়া বংশগতি আলোচনা করব। β থ্যালাসেমিয়া রোগীর দেহের ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকে β^+, β^0। সেইজন্য হোমোজাইগাস $\beta^+\beta^+$ বা $\beta^+\beta^0$ হল থ্যালাসেমিয়া মেজর। এদের শরীরে থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। হেটারোজাইগাস $\beta^+\beta$ বা $\beta^0\beta$ হল থ্যালাসেমিয়া মাইনর, যার দেহে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কারণ আগেই আলোচিত হয়েছে, থ্যালাসেমিয়া অটোজোমিয় প্রচ্ছন্ন জিন ঘটিত অসুস্থতা।

থ্যালাসেমিয়া রোগীর পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করলে তাদের অবশ্যই থ্যালাসেমিয়ার জন্য দায়ী জিন পাওয়া যাবে। থ্যালাসেমিয়া রোগীর বংশতালিকা বিশ্লেষণ করলে তার কারণ সঠিকভাবে বোঝা যাবে। বংশতালিকা বিশ্লেষণ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে জেনেটিক কাউন্সেলিং দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মে এই রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা সুনিশ্চিত করা যায়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল যা থেকে বোঝা যাবে থ্যালাসেমিয়া জিন কিভাবে সন্তানে (পুত্র বা কন্যা) বর্তায়।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া ঃ ইহাও এক প্রকার অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন মিউটেশন ঘটিত রোগ। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান বিজ্ঞানী জেমস্ বি হেরিক একজন নিগ্রোর রক্তে বিশেষ ধরণের লম্বাটে কাস্তে আকৃতির ভঙ্গুর লোহিত কণিকা দেখতে পান, যেগুলি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম রক্তবাহিকায় জমা হয়ে ওই স্থানে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করে দেয়, এর ফলে বিভিন্ন কলা নষ্ট হয় ও রোগী সাধারণত বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মারা যায়।

লক্ষণ ঃ ১) সিকেল সেল লোহিত কণিকা ভঙ্গুর হয় ও ক্রমাগত ভাঙ্গার জন্য সারাজীবন অ্যানিমিয়া দেখা যায়। ২) সিকেল সেল সুক্ষ্ম রক্তবাহিকা বন্ধ করে দেয় ফলে কলা কোষে অক্সিজেনের ঘাটতি হয় যা কোনো কোনো কলার ব্যাপক ক্ষতি করে ও জ্বালা যন্ত্রণা হয়। ৩) রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ৪) হোমোজাইগাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মারা যায়।

হিমোগ্লোবিন হল এক প্রকার সংযুক্ত প্রোটিন, তাতে লৌহ (Fe) যুক্ত হিম অংশ ও গ্লোবিন নামক প্রোটিন থাকে। গ্লোবিন প্রোটিনে মিউটেশন দেখা যায়। একটি হিমোগ্লোবিনে দুটি অনুরূপ β ও α চেন ও দুটি অনুরূপ β চেন অর্থাৎ মোট চারটি স্বতন্ত্র পলিপেপটাইড চেন থাকে। α ও β চেনের রাসায়নিক প্রকৃতি ও ইলেক্ট্রোফোরোটিক ধর্ম আলাদা, কিন্তু α চেন ও β চেনের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। প্রতিটি চেনে প্রায় ১৪০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন ও সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনকে যথাক্রমে HbA ও HbS বলা হয়। আরেকরকম অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনকে HbC বলে। এই তিন প্রকার হিমোগ্লোবিনের নিয়ন্ত্রক অ্যালিলগুলি যথাক্রমে Hb^A, Hb^S, Hb^C। এইসব হিমোগ্লোবিনের চার্জের পার্থক্য আছে, তা দুটি কারণে হয় – ১) হিমোগ্লোবিনে প্রোটিনের ভাঁজ হওয়ার তারতম্যের জন্য। ২) অ্যামাইনো অ্যাসিডের তারতম্যের জন্য।

বিজ্ঞানী ইনগ্রাম (১৯৬৩) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন Hb^A, Hb^S, Hb^C-এর মধ্যে কেবল একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্থক্য থাকে, HbSতে দুটি স্বাভাবিক α গ্লোবিন চেন ও β দুটি অস্বাভাবিক β গ্লোবিন চেন থাকে। HbA-এর β চেনের ৪ ও ৬ নং স্থানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে। কিন্তু HbS-এর ৬ নং স্থানে গ্লুটামিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন থাকে, HbCতে ঐ স্থানে লাইসিন থাকে। β চেনের ৬ নং স্থানে ভ্যালিন থাকে, ফলে অক্সিজেনের অভাব হলে HbS-এর আচরণে পার্থক্য হয়, যতক্ষণ পরিমাণ মতো অক্সিজেন থাকে ততক্ষণ HbS লোহিত রক্তকণিকার সঙ্গে দ্রবণীয় থাকে। কিন্তু অক্সিজেনের অভাব হলে হিমোগ্লোবিন অণুগুলি একত্রে সঞ্চিত হয় ও অদ্রবণীয় হয়ে থিতিয়ে পড়ে, এর ফলে লোহিত কণিকা শক্ত ও কাস্তে আকৃতির হয়।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া β গ্লোবিন জিনের একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিয় টাইডের মিউটেশনের (থাইমিন→অ্যাডেনিন) জন্য ঘটে। ইহা একটি পরিবর্তিত কোডন সৃষ্টির (GAG এর স্থানে GUG) জন্য হয়, যা β চেন-এর ৬ নং স্থানে গ্লুটামিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন সংযুক্ত করে। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হোমো জাইগাস বা হেটারো জাইগাস অবস্থায় হতে পারে। হোমো জাইগাসের ক্ষেত্রে β চেনের কোড তৈরীর জন্য দুটি মিউট্যান্ট জিনের (বাবা ও মা'র থেকে ১টি করে) উত্তরাধিকার ঘটে। হেটারোজাইগাসের ক্ষেত্রে β চেনের একটি জিন ত্রুটিপূর্ণ ও অপরটি স্বাভাবিক, লোহিত কনিকায় হেটারোজাইগোট অবস্থায় HbA ও HbS ও থাকে, এদের সিকেল সেল ট্রেট বলা হয়, যারা স্বাভাবিক জীবনকাল যাপন করতে পারে ও সাধারণত রোগ লক্ষণ প্রকাশ করে না।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার বংশগতি পূর্বে বর্ণিত থ্যালাসেমিয়ার বংশগতির মতো হয়। (ক্রমশঃ) ■

সংগঠন সংবাদ

গত ৩ মাসে 'বিজ্ঞানমনস্ক' তার কর্মীদের বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করার স্বার্থে অধ্যয়ন ও আলোচনা চালাবার পাশাপাশি বিভিন্ন গণসচেতনামূলক অনুষ্ঠান, সমীক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চালাবার প্রয়াস রেখেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে আমাদের মতামত প্রচারে নিয়ে গেছে, বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের আমন্ত্রণে তাদের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনে আমাদের মতামত পেশ করেছে, বিতর্কে অংশ নিয়েছে এবং যৌথ আন্দোলন চালাবার প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি সামাজিক বিষয় নিয়ে অন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সংগঠনের সভার রিপোর্ট এই পত্রিকায় পৃথকভাবে পেশ করা হ'ল।

বিগত সময়ে যে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চালিয়েছি তা পেশ করা হ'ল।

গণিপুর হাইস্কুলে সাপ ও ভেজাল নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শন

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে 'বিজ্ঞান মনস্ক'-র পক্ষ থেকে মহেশতলার গণিপুর হাইস্কুলে সাপ ও ভেজাল নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে 'বিজ্ঞান মনস্ক'-র পক্ষ থেকে সাপের দৈহিক গঠন, জন্মবৃত্তান্ত, সাপের বিভিন্ন প্রজাতি ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত বিষধর সাপ নিয়ে এক বিস্তৃত আলোচনা রাখা হয়। পরিশেষে বলা হয় যে সাপ নিয়ে আমাদের যতই জ্ঞান থাকুক না কেনো, যখনই কাউকে সাপ কামড়াবে তখনই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে সাপের কামড়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান অ্যান্টি স্নেক ভেনাম-এর অনুপস্থিতির জন্য যথেষ্টই উদ্বেগজনক। তাই যেখানেই বিষাক্ত সাপের উপদ্রব, সেখানেই সেখানকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যান্টি স্নেক ভেনাম রাখার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলার আবেদন রাখা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে ভেজাল নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের এই অংশে বিভিন্ন খাবারে কি কি ভেজাল মেশানো হয় ও সেই বিভিন্ন ভেজালের জন্য মানব শরীরে কি কি ক্ষতি হয় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়। পরিশেষে বলা হয় যে, যে দুধওয়ালা দুধে ভেজাল দেয় সে নিজে মাছে ভেজাল খায়, যে মাছে ভেজাল দেয় সে চালে ভেজাল খায় ইত্যাদি অর্থাৎ ভেজালের জাল থেকে কেউই রেহাই পায় না, আর প্রতিটি খাবারে যদি ভেজাল ধরতে হয় তাহলে প্রতিটি মানুষের বাড়িতে ল্যাবরেটারি বানাতে হবে, যা অসম্ভব। তাই ভেজাল রোধে সরকারী যে সকল আইন আছে তা বলবৎ করার জন্য গণ-আন্দোলন করার আবেদন রাখা হয়।

অনুষ্ঠানের পরে ছাত্রদের মধ্যে 'বিজ্ঞান মনস্ক'-র সদস্য হওয়ার জন্য ফর্ম নেওয়ার উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।■

গোয়ালবেড়ের শ্রীকৃষ্ণনগর হাইস্কুলে পরিবেশের পরিবর্তনের উপর বক্তব্য ও খাদ্যে ভেজাল নিয়ে প্রদর্শন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোয়ালবেড়ের শ্রীকৃষ্ণনগর হাইস্কুলে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে পরিবেশের পরিবর্তনের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা হয় ও খাদ্যে ভেজাল নিয়ে প্রদর্শন ও আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে অনুষ্ঠানটি অনুধাবন করেন। তাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন থেকেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাদের জানার আগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রধান শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়।■

সপ্তমীর রাতে সুন্দরবনের গোসাবায় অনুষ্ঠান

গত ৩রা অক্টোবর সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলের রাধানগরে একটি পূজা প্যান্ডেলে 'বিজ্ঞান মনস্ক'-র পক্ষ থেকে কুসংস্কার বিরোধী যুক্তিবাদী প্রদর্শন, সাপ নিয়ে আলোচনা, চলচিত্র প্রদর্শন এবং জিমন্যাস্টিক করে দেখানো হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ দুর্গাপূজোর আনন্দে মেতে থাকলেও অনুষ্ঠান ও আমাদের বক্তব্য শুনে সোৎসাহে তাতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের পর বিশেষতঃ বয়স্ক মানুষেরা উৎসাহ নিয়ে আমাদের কর্মীদের সাথে জানাবোঝা করেন। এই অনুষ্ঠানে ক্যানিং-এর 'ভোরাই' নাট্য সংস্থাও দু'টি নাটক প্রদর্শন করে।■

নবমীর সন্ধ্যায় ঠাকুরপুকুরে যুক্তিবাদী প্রদর্শন

গত ৫ই অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ঠাকুরপুকুরের পশ্চিম বড়িশা সরকারী আবাসন সাহিত্য সংস্কৃতি চক্রের আমন্ত্রণে 'বিজ্ঞান মনস্ক'-র পক্ষ থেকে এক যুক্তিবাদী প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার লৌকিক কারণগুলি বিজ্ঞান মনস্ক-র কর্মীরা ব্যাখ্যা করেন, এছাড়া পরিবেশ নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা হয় ও মৃত সাপের প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় যা দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। বিজ্ঞান মনস্ক-র এক কর্মী ও সদস্য দ্বারা রচিত **'হাসপাতাল'** কবিতা মঞ্চে আবৃতি সকল দর্শকের মনকে নাড়া দেয় ও বেশ কিছু দর্শক কবিতা সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন, যা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।■

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে বিজ্ঞান মনস্ক'র সেমিনার

গত ২৩শে অক্টোবর শিলিগুড়ির তথ্যকেন্দ্রে (রামকিংকর সভাঘর) 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব'-এর আমন্ত্রণে 'ভূমিকম্প – কারণ এবং পূর্বাভাস' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র ৩ জন বক্তা ভূমিকম্প কী, এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী, ভূমিকম্প নিয়ে জনগণের মধ্যে টিঁকে থাকা নানা কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক ধারণার খণ্ডন, ভারতের ভূকম্প প্রবণ অঞ্চল কোথায় তা চলচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করেন। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং এই অঞ্চলে সক্রিয় চ্যুতিতল কোথায় কি আছে এবং ভবিষ্যতে ভূমিকম্পেরর সম্ভাবনাও ব্যাখ্যা করা হয়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা কবে কোথায় সফলভাবে এই পূর্বাভাস করেছিলেন তাও উল্লেখ করা হয়। ১৯৯০-এর দশক থেকে জাপান সহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র (ভারত সহ) "পূর্বাভাস অসম্ভব তাই এর জন্য খরচ অর্থহীন", প্রচার করছে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পুঁজিনিবেশকারীরা সেখানেই পুঁজি নিবেশ করেন যেখানে পুঁজি মুনাফা দেয়। এই কারণে এই গবেষণায় কোন রাষ্ট্র এবং পুঁজিসংস্থা বিনিয়োগে রাজী নয়। বক্তারা একটি বড় ভূমিকম্পকে কিভাবে অসংখ্য ছোট ছোট ভূমিকম্পে বিভক্ত করা যায় তার বিজ্ঞানও তুলে ধরেন। এরপর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে (বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে) পাহাড়ী নদী (যেমন তিস্তা)তে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরা হয়।

প্রায় আড়াই ঘন্টা সেমিনার চলার পর উপস্থিত দর্শকরা আরও প্রায় ১ ঘন্টা ধরে নানান প্রশ্ন রাখেন। তিস্তায় বাঁধ নির্মাণ করা সঠিক কিনা, উন্নয়নের নামে পাহাড়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে বলে কয়েকজন শ্রোতা মন্তব্য করেন। 'বিজ্ঞান মনস্ক'র বক্তারা এর উত্তরে বলেন যে বিজ্ঞান সম্মত এবং জনসাধারণের স্বার্থের উন্নয়নের আমরা বিরোধ করতে পারি না। আর আদিবাসীদের আদিবাসী করে রাখা প্রগতিশীলতা নয়। তাদেরও সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে এসে উন্নয়ন প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য পরিবেশ নষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয় – পরিবেশের পরিবর্তন সর্বদা হয়ে চলে, পরিবেশের সাম্য গতিশীল, এই বিজ্ঞান মাথায় রেখে পরিবেশ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থ বিদ্যা পঠন পাঠনের কোনও বন্দোবস্তো নাই। ভূতাত্ত্বিকভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এটা না থাকা খুবই দুঃখজনক। সভা থেকে অবিলম্বে উত্তরবঙ্গে ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থ বিদ্যা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করার দাবী জানানো হয়। সভায় উপস্থিত শ্রোতারা ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। সমীক্ষণ ও অন্যান্য পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করার উৎসাহ ছিল লক্ষ্যণীয়। বহু মানুষ সমীক্ষণের গ্রাহক হতে চেয়েছেন এবং 'বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।■

গল্প

রামধনুর খোঁজে

– অন্যরূপ

আরে এ কোথায় এলুম ! এরোপ্লেনের ডানায় চেপে ! নীল মেঘের মতো মাটি নাকি সাদা সাদা মেঘ জমানো পাহাড় না মেঘের ঢিপি ! আরে ওই একগোছা সাদা মেঘ আসছে - এমা মেঘগুলো আদর করে দিয়ে চলে গেল - একি একি প্লেনের ডানাটা এমন কাঁপছে কেন ? নেমে যাচ্ছে - নেমে যাচ্ছে - হু হু করে নেমে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছি নাকি - মা...মা...মা... ।" ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গলু এরোপ্লেনে ওড়ার স্বপ্ন দেখছিল। মা এসে ওর গা নেড়ে নেড়ে ডাকছিলেন।

'গলু..গলু..গলু..ওঠ। কারখানায় যাবি না বাবা।'

'মা'

'কি হয়েছে ? চেঁচাচ্ছিলি কেন বাবা, মা মা করে ?'

স্বপ্নের কথা মনে করে গলু লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়। মনে পড়ে যায় ওর রোজকার রুটিনের কথা আর সত্যসত্যই এবার ও বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ে। চোখ মুছতে মুছতে গলু মা'কে বলে – 'মা আজ শরীরটায় বড্ড ব্যথা, না গেলে হবে না মা ?' মা-এর চোখ ছলছল করে ওঠে, "কেন বাবা, কাল কি খুব খাটিয়েছিল ?"

'হ্যাঁ মা পূজো এসে গেছে তো। দম্ ফেলতে দেয়না মোটে। খালি কাজ আর কাজ।'

মা গলু'র মাথাটা কোলে টেনে নেয়, 'কাল তো বিশ্বকর্মা পূজো, ছুটি পাবিনা বাবা ?'

'জানিনা মা, গতবারে তো যেতে হয়েছিল।'

'কি করবি বাবা, এবছরটা যা কষ্ট করে, সামনের বছরে আবার তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেব।'

গলু দশ বছর থেকে বারোয় পড়েছে। মা তাকে কাজে ঢোকানোর পর থেকে এই কথা বলে আসছে, কিন্তু পারছে না তাকে ছাড়িয়ে আনতে।

গলু ইস্কুলে যেত। চার ক্লাস অব্দি পড়েছিল ইস্কুলে। এখন মায়ের কাছে কৃচিৎ সময় পেলে পড়ে। কিন্তু স্কুলে যে কি শিখেছিল ওর বিশেষ কিছু মনে নেই। রোজ দুপুরে গরম ভাত বা খিচুড়ী খাওয়া এটাই শুধু মনে রয়ে গেছে। এখন শুধু ঠান্ডা ভাত আর মালিকের ঠান্ডা চোখের রক্তরাগ।

কিন্তু সেই গরম ভাতের দিন হঠাৎ মুছে গেল, বাবা কোথায় চলে গেল - আর আসে না। গলুর নীচে একটা ভাই আর এক বোন। পরের বাড়ী কাজ করে মা চারটে পেট চালাতে পারে না। পরের ভাইটা আজও ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়নি - সেও হয়তো যাবে গলুর সঙ্গে কারখানায়।

গলু তাড়াতাড়ি বলে, 'মা, আমি আর ইস্কুলে যাব না। তুমি বরং মলুকে ইস্কুলে দাও।'

মা গলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গলু বুঝতে পারে মা গলুর কথার তাৎপর্যটা তলিয়ে ভাবছে। মাকে যেন একটু চিন্তিত লাগে।

গলু আর কথা বলে না, চলে যায় পুকুর পাড়ে। প্রাতঃকৃত্য সেরে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকে। মা ততক্ষণে খাবারের পুঁটলীটা গুছিয়ে দিয়েছে। গলুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এক কাপ কালো চা আর একটা বাসী রুটি। গলু খেয়ে নেয়। মা আবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

গলু 'আসছি' বলে বেরিয়ে পড়ে। ভাইবোনেরা এখনও ঘুমোচ্ছে। মা ওদের এইভাবে রেখেই কাজে বেরিয়ে যাবে এখন।

রোগা পাতলা দুবলা চেহারার গলু খাবারের পুঁটলী নিয়ে হন্ হন্ করে চলেছে ষ্টেশনের দিকে।

প্রথম প্রথম সে পাড়ার আজব ভাইয়ের সঙ্গে যেত। আজব ভাই ওখানে কাজ করতো তো। হঠাৎ একদিন আজব ভাই কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মা বলল, 'পারবিতো বাবা একা যেতে ?' ততদিনে বছর খানেক যাওয়া হয়ে গেছে। পাড়ার আরও একটা ছেলে যায়। বলল, 'পারব মা। নিতাই তো যায়।'

মা একটু চুপ করে ভাবে তারপর বলে, "আর কে যায় বাবা ? আজবের ভাইরা কি আর যায় ?

"হ্যাঁ মা ওরা যায়, আরও অনেক ছেলে যায় ট্রেনে।" মার চোখে আবার স্বস্তির ছায়া। মার মুখের এই প্রশান্তিটা দেখতে গলু খুব ভালবাসে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলির মুখেই নিতাইয়ের বাড়ী। জিজ্ঞাসা করে জানল ও বেরিয়ে গেছে। নিতাইও খুব অভাগা। বাবা সারাদিন নেশা করে পড়ে থাকে। মা কার সাথে যেন বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। নিতাই-এর এক বছরের বড়ো দিদি, সেই বাড়ী সামলায়। আজব ভাই আর পাড়ার লোকেরা মিলে নিতাইকে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

নিতাই কেন আগে চলে গেল, গলুর একটু মন খারাপ হল। পাক্কা পনেরো মিনিট এখন গলুকে হাঁটতে হবে। তারপর বুনোর হাট ষ্টেশন। তারপর মাত্র দশটা ষ্টেশন পরেই নীলামপুর। সেখান থেকে আরও আধঘন্টা হাঁটলে তবে ওর কাজের জায়গা - এয়ারপোর্টের ধারে।

গলু আবার স্বপ্নটার কথা ভাবতে থাকে। এরোপ্লেনের ডানায় - হাঃ ভাবতেই গলুর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সারাদিন প্লেনের ওঠা নামা দেখে গলু – কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তাই বোধহয় স্বপ্নটাও দেখে ও – প্রায়ই দেখে – আর পড়ে যায় প্লেনের ডানা থেকে মাটিতে। আর রোজই স্বপ্নটা দেখতে দেখতে মায়ের ডাকে ওর ঘুম ভাঙ্গে। স্বপ্নটা ওর মাথায় গেঁথে আছে।

নিজের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে গলু খেয়ালই করেনি নিতাই ওকে অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে

"গলু গলু গলু"

"আরে নিতাই!"

নিতাই পাঁই পাঁই করে দৌড়োচ্ছে আর পিছন ফিরে ফিরে গলুকে ডাকছে। গলু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে "নিতা-ই চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"চেঁচাচ্ছি কোথায়? তোকে সেই কখন থেকে ডাকছি শুনতেই পাচ্ছিস না যেন।"

"দাঁড়ানা দাঁড়ানা" বলে গলুও ওর পিছন পিছন ছুটতে থাকে।

"ট্রেন ফেল হয়ে যাবে না? চম্‌কইরা আবার জায়গা রাখবে কিনা কে জানে!"

(২)

ছুটতে ছুটতে ষ্টেশনে গিয়ে নিতাই আর গলু দেখে লোকালটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে – আবার ছুটতে থাকে নিজেদের বন্ধুদের কামরাটা ধরার জন্য। ট্রেনে ভোঁ দেয়। ওরা চলন্ত ট্রেনে ওঠে – সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক সহযাত্রীর সাদর অভ্যর্থনা।

"আয় আয় আয়"

"আমরা তো ভাবলাম ট্রেনটা পাবি না"

"তোরা এত ঘুমোস কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক একজনের এক এক রকম বক্তব্য।

সবাই এক জায়গায় নামে না। তবুও সবাই বালক – কারখানার বালক – পড়াশুনা না করতে পাওয়া বালক – প্রাণে আবেগ – রক্তে উদ্দীপনা – বুকে কি আশা আছে? কিসের আশা?

"এই এই এই চুপ করে দাঁড়ানা। গায়ের উপর পড়ে যাচ্ছিস যে ?"

সঙ্গে সঙ্গে কারখানা বালকদের আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ে যায়। চম্‌কাইরা আর কটা জায়গা রাখবে ! দলে তো ওরা অনেকজন, তাই সবসময়ই সবাই ভাগাভাগি করে বসে। সর্বদাই কয়েকজনকে দাঁড়াতে হয়।

আর বালকদের যা স্বভাব – খুনসুটি ঝগড়া, নিজেদের মধ্যে খেলা খেলা মারামারি করা – অন্য যাত্রীদের একটু অসুবিধা হয়ই। কিন্তু বাড়ীর ছোটো বয়সের ছেলেদের কি আমরা এইভাবে দাবিয়ে রাখি না রাখতে পারি ? সস্নেহ প্রশ্রয় দিই। কিন্তু ট্রেনে পরিবেশ অন্যরকম। টীকা টীপ্পনী উপদেশের ঝড়। কারণ ওরা যে অভিভাবকহীন – যে পারে ওদের এবং ওদের চোদ্দপুরুষকে অভিযুক্ত করে।

"আর এদের জ্বালায় শান্তিতে যাবার জো নেই।"

"মা-বাবা যে কিকরে এইসব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাজ করতে পাঠায় !

এই সব গা জ্বালানো মন্তব্যে বাচ্ছাগুলো সবসময় চুপ করে থাকতে পারেনা। বলে ফেলে মুখের উপর দু-চারটে কথা।

"আপনার তাতে কি কাকীমা ?"

"আপনার এত অসুবিধে হচ্ছে কেন কাকু ?"

কথার পিঠে কথায় সমস্যা বাড়ে বই কমে না। আরও কথার তুবড়ী উঠতে থাকে তখন।

"দেখেছো আবার মুখে মুখে কথা চোপা ?"

"লঘু গুরু জ্ঞান নেই ?"

"শিখবে কোথা থেকে, সেই রকম বাবা-মা আর কি নইলে পেট থেকে পড়তে না পড়তেই রোজগার করতে পাঠিয়েছে!"

বাচ্চাগুলো বেশীক্ষণ এইসব চোখা চোখা বাক্যবাণের

সামনে যুঝতে পারেনা – চুপ করে যায়। গলুর খুব কষ্ট হয় এসব শুনলে। ওর মায়ের মুখটা মনে পড়ে, ও কখনও মাকে একথা বলেনা, পাছে মা আরও কষ্ট পায়।

মাঝে মাঝে একটা দুটো বড়ো ছেলে ওদের সঙ্গে ওঠে। অনেকদিন ধরে ওরা কারখানায় যাচ্ছে। বড়ো বড়ো চুল, ঢোলা জামাপ্যান্ট; সিগারেট, খৈনী খায়। নিজেদের মধ্যে চুপচাপ কিসব কথা বলে। কিন্তু গলুদের দলটাকে যদি কোনদিন কেউ খুব উত্যক্ত করে তবে কাঁচা গাল দিয়ে একদম থামিয়ে দেয়।

"এই যে দিদিমনি অত গরম দেখাবেন না, সব বেশ্যার ছেলে আছে বুঝলেন, অসুবিধে হলে অন্য কামরায় যান।" অথবা

"এই যে কাকু বাড়ীর ছেলেগুলোকে শেখান গিয়ে, সব তো বিড়ি ফুঁকে আর মাগীবাজী করে মরছে। নিজের চরকায় তেল দিন।"

সেদিন ওই দাদাগুলো ছিলনা। আর চম্‌কাই, নিতাই আকবর, গলুদের উচ্ছ্বাসের পর্দা নামতেই চাইছিল না। না পাওয়ার ট্রেন পেয়ে যাওয়াটাই যেন মজার ব্যাপার। যে কোন কথাতেই হেসে হেসে এ ওর গায়ে এলিয়ে পড়ছিল। শুরু হল বাক্য বাণ।

অসহায় গলুরা হঠাৎ ইলেকট্রিক শক লাগার মত চুপ হয়ে যায়। ট্রেনের দুলুনিতেই ওরা এ ওর গায়ে পড়ে যায়।

যখন গলুদের বাপ-পিতামহরা কুৎসা বা শব্দের অপব্যবহারে খান খান হয়ে যাচ্ছেন তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা কণ্ঠে কামরার সকলে চম্‌কে উঠল।

"এদের বাবা মা কারা ? তারা কি করে ? কি খায় ? তা কি নিতান্ত অজানা আপনাদের ? এবং কেন এমন জীবন যাপনে বাধ্য হয় তাও কি জানা নেই আপনাদের ? আর কেন এই শিশুগুলো ছাত্রবয়সটা কারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে জীবনের সম্বল করেছে তাও কি বুঝতে অসুবিধা আপনাদের? তাহলে আসুন টোল খুলে আপনাদেরই শিক্ষা দিই আগে।"

সবার চোখ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল সেই অভিমুখে - যেখান থেকে ওই কড়া কড়া শব্দবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কামরায় এক কোণে কে একজন চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল, গলু উঠেই লক্ষ্য করেছিল। এখন দেখল বড় বড় চুল দাড়িতে মুখ ঢাকা নীল চেক লুঙ্গী পড়া আজব ভাই চাদরটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আর বলে যাচ্ছে চাবুকের মত শক্ত শক্ত কথা।

হ্যাঁ 'ভদ্রলোকগুলো'র গায়ে বোধহয় বিঁধল কথাগুলো। মুহূর্তে সবাই চুপ। কিন্তু বালকদের কোলাহল গেল দ্বিগুণ বেড়ে। হুড়মুড় দুদ্দাড় করে অন্য যাত্রীদের তোয়াক্কা না করে সবাই ধেয়ে গেল আজব ভাই-এর দিকে।

"আজব ভাই তুমি ?"

"কোথায় ছিলে তুমি ?"

"আর কোথাও যাবেনা তো ?"

গলু, নিতাই, ফজলুল, চম্‌কাই, বাবলু, আকবর, নিধু, ভ্যাবলা, রফিক সবাই গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আজব ভাই-এর কোলে। এতটা আবেগের কারণ অবশ্য কিছুটা প্রতিপক্ষের একতরফা ব্যাটিং-এ পর্য্যদুস্ত হতে হতে হঠাৎ হালে পানি পাবার ফলেই।

'আজব ভাই' লোকটা আজবই বটে। বছর তিরিশের হাট্টা কাট্টা যুবক বড়ো পরোপকারী মানুষ; পাড়ায় সবধরণের মানুষই তাকে পছন্দ করত। মানুষের আপদে বিপদে খুব ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর সময়ই বা যতটুকু ! কোন ছোটো বেলায় সারেঙ্গ চাচা তাকে কারখানার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ! তবুও ওর নিজের সময়টুকু ও পাড়াতেই দিত।

বাড়ীতে পাঁচমা আর তাদের অগুন্তি কাচ্চা বাচ্চার মধ্যে মানুষ। তার আম্মি আব্বার প্রথম বৌ এবং সেই বড় ছেলে। বাবাকে সে মাঝে মাঝে দেখত আসতে। আসলেই মায়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত আব্বার সেবাযত্ন করতে। আর সামনে কোনও কাঁদুনে বাচ্ছা পড়লেই হল আব্বা বেদম ঠ্যাঙ্গাত। এই বাড়িটা আর বাড়ির লাগোয়া সামান্য একটু জমি ব্যাস চালাও পাঁচবৌ তোমাদের ছেলেপুলেদের নিয়ে সংসার। কখনও কখনও কিছু টাকা এনে দিত। তারপর গেল সবকিছু বন্ধ হয়ে। লোকটা মরে গেল নাকি আর কোথাও পাঁচটা বৌ নিয়ে ফেঁসে গেল – জানা নেই। আর আজব জানতেও চায় না। পাঁচমা আজবকে মাঝে মাঝে খোঁচাত। আজব ভাবত, 'কি দরকার।' মায়েদের তো এইভাবেই কোনমতে সংসার চালাতে হবে। মুরগির ডিম বা ছাগলের দুধ বিক্রি করে, গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বিক্রি করে বা কারো ধান ভেঙ্গে বা মুড়ি ভেজে বা কুচি খেতের দু-চারটে আনাজ বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের জন্য শুধু আলুসেদ্ধ ভাত জোগাড় করছে যৌথ সংসার। মাঝে মাঝে খাল-বিল হাঁচা করে দু-চারটে চুনো মাছ, কাঁকড়া বা চিংড়ী বা গেঁড়ী-গুগলী – বেহেস্ত! যেদিন বাড়িতে খুশির রোশনাই !

মায়েদের খুব মিলমিশ - এবেলা গালি পেড়ে পাড়া কাঁপিয়ে ঝগড়া করে তো ওবেলা পা ছড়িয়ে একে অপরের চুল বাঁধতে বাঁধতে সুখ-দুঃখের কথা কয়।

আব্বার এই কীর্তি দেখে আজবের কখনও বিয়ে করার সাধ জাগেনি। সবচেয়ে ছোটো তিনটে ভাই ফজলুল, আকবর

আর রফিক তার বড় ন্যাওটা ছিল। গলুরই বয়সী হবে। অন্য তিন মায়ের সন্তান। ওদেরও কারখানায় ভর্তি করে দিয়েছিল আজব। না ইস্কুলে নয়। গলুদের কারখানার কাছেই।

আজব ভাই অদৃশ্য হবার পর ভাইগুলো খুব মুষড়ে ছিল কয়েকদিন। আজ তো দেখতে পেয়েই ছুট - খুশী-খুশী-খুশী। আজবভাই গলুদেরও খুব ভালবাসত। মাঝে মাঝেই লজেন্স কিনে দিত।

ইত্যবসরে ট্রেন তো নীলামপুর পৌঁছে গেছে। সবার নামার তাড়া। আজব ভাই কারখানায় যাবেনা তবে সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে ফেরার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছেলেরা নামল। এদের মধ্যে চম্‌কাই আর ভ্যাবলা অবশ্য দুটো ষ্টেশন আগেই নেমে গেছিল। ওখানেই ওদের কাজের জায়গা। গলুরা নেমেই ছুটল যে যার কাজের জায়গার দিকে। ফজলুল, রফিক আর আকবর তখনও ছিল – ওদের দাদা তো ! কয়েক পা এগিয়েই গলু বুঝতে পারল ওর খাবারের পুঁটলীটা নেওয়া হয়নি। নিতাইকে দাঁড় করিয়ে দুদ্দাড় করে ছুটল। ট্রেনের লোকজন নেমে গেছে। কামরায় উঠতে গিয়ে আজব ভাইয়ের গলা পেল, বুঝল ফজলুল, আকবর আর রফিক তখনও আছে। গলুর কি যেন মনে হল হুড়মুড় করে উঠতে গিয়েও থেমে গেল, শুনল আজব ভাই বলছে,

"তোরা আমার ছোটো ভাই। তোরা আমার সঙ্গেই যদি থাকতে চাস তবে চল এই কারখানা ছেড়ে -বেইজ্জতীর কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করবি। অনেক বড় কাজ করবি।

"কিন্তু ভাইজান... "ফজলুল কি একটা বলতে যাচ্ছিল–

"না এখন কোন কথা নয়। এখন কাজে যা। সাতটার সময় বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়াবি। আমি আসব।"

গলুর একটু অভিমান হল, আজব ভাই শুধু আকবরদের কথাই ভাবছে – নিজের ভাই বলে ! ওদের ভাল কাজ দিতে চাইছে ? আর গলু বুঝি কিছু না ? দুঃখ দুঃখ মুখ করে এবার ও গুটি গুটি কামরায় ঢুকে তাক থেকে খাবারের পুঁটলীটা নামাতে যায়। আজব ভাই হেসে ওর কোমর ধরে উঁচু করে।

'গলু ভাই ভাল আছ তো ? মা ভাইবোনেরা সব ভাল আছে তো ?"

গলু ঘাড় নেড়ে বলে, "আজবভাই তুমি গ্রামে যাবেনা ?" আজব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় –

"যাব গলুভাই যাব। অনেক বড় কাজ পেয়েছি তো তাই যেতে পারছিনা। মাকে আমার নমস্কার জানাবে।"

ফজলুলরা ততক্ষণে নেমে গেছে। গলু আস্তে আস্তে নেমে যায় ট্রেন থেকে। এদিকে নিতাই দৌড়ে এসে চেঁচাচ্ছে, "কিরে গলু এতক্ষণ কি করছিস? দেরী হয়ে যাচ্ছে যে ? দেরী হলে সন্ধ্যাতেও বেশিক্ষণ আটকে রাখবে। চল তাড়াতাড়ি।" এবার দুজনেই ছুটতে শুরু করে।

গলুর মনে সারাদিন আজব ভাইয়ের শুধু নিজের ভাইদের বেশি ভালবাসার কথাটা মনে করে কষ্ট হতে থাকে। দুপুরে টিফিনের সময় একটু কেঁদেও ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছে নিল। আজব ভাই-ই একদিন তার হাত ধরে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, এ নীলকান্ত আমার ছোটো ভাই দেখবেন মালিক।"

"ভাই কিরে ?"

'ওই হোল, পাড়ার সব ছেলেরাই আমার ভাই।" সেই ম্যানেজার এখন আর নেই।

রাতে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে কোনমতে কিছু খেয়ে বিছানায় যায়। আবার নীরবে কাঁদে গলু। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। ভাঙ্গা তক্তপোষে তিন-ভাইবোন আর মা কোনমতে পাশ ফিরে শুয়ে থাকা।

রাতে শরীরের রোগ জ্বালার বেদনার মত মনের ব্যথাও বাড়ে। কত রকম দুঃখ কষ্ট বঞ্চনা কেমন যেন আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। সকালের সূর্যের আলোয় আবার সব কিরকম ফিঁকে হয়ে যায় – পালিয়ে যায় দুশ্চিন্তাগুলো – ওরা যেন সূর্যকে ভয় পায়।

গলুরও তেমনি হল পরের দিন সকালে উঠে - একদম খুশী - ভীষণ খুশী - কেন ? আজ কারখানায় বিশ্বকর্মাপূজোর ছুটি দিয়েছে মালিক। বড়োদের যেতে হবে, তবে কাজ নেই তেমন। গলুরা পরশু দিন প্যাকেট পাবে। কত কি থাকবে তাতে ! তার মধ্যে কমলা রঙের লাড্ডুটা গলুর খুব পছন্দ! আর সুজির পুর দেওয়া কি যেন একটা থাকে - সেটাও বেশ! সকাল থেকে অনেকদিন বাদে ভাইবোনেদের সঙ্গে খুব খেলা হল। আজ দুপুরে মা ভাইবোন আর গলু একসঙ্গে খাবে। মা কাজ থেকে ফিরে স্নান করে ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ করল। আঃ ডালের কি সুন্দর গন্ধ! রোজই তো হয় আলু সিদ্ধ নয় শাক সিদ্ধ। আজ উৎসব !

মা খাবার বাড়তে বাড়তে খুব চিন্তিত মুখে বলে "বাবা কাল আজবের তিন ভাই তোদের সঙ্গে কারখানায় গেছিল ?"

"হ্যাঁ মা কেন ?"

"ওরা কাল বাড়ী ফেরেনি বাবা।' ওর মায়েরা বেলায় কারখানায় ফোন করেছিল। সেখানে নেই। কাল সন্ধ্যায় ছুটির পরই চলে গেছিল।" বলতে বলতে মার গলাটা কেঁপে ওঠে।

গতকালের ট্রেনের কথা মনে করে গলুর আবার কান্না

পেয়ে যায়।

কান্না ভেজা গলায় বলে, "মা ওরা বোধহয় আজবভায়ের সঙ্গে গেছে ?"

মা অবাক হয়, "আজব ! সে তো বছর খানেক হল দেশ ছাড়া। আর ওতো কি একটা দলের পাল্লায় পড়েছে কানে এসেছিল !"

"মা আজবভাই কাল এসেছিল। আমাদের খুব..." বলতে বলতে গলু কেঁদে ফেলে।

মা আরও অবাক হয়, "কি হল বাবা, কি হয়েছে ?"

গলু আর পারেনা। গতকালের ঘটনাটা আদ্যপ্রান্ত বলে। সকালে তথাকথিত ভদ্রলোকদের দ্বারা হেনস্থার হাত থেকে বাঁচানো থেকে লুকিয়ে কথা শোনা পর্যন্ত। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে, "মা আজব ভাই আমাকে ভাল কাজ দিল না তো ?"

মা ছেলের ছেলে মানুষী দেখে হাসবেন না জলজ্যান্ত তিনটে ছেলে কার না কার হাতে পড়ল ভেবে কাঁদবেন, নাকি ছেলেরা সকালে নিত্যযাত্রীদের হাতে এভাবে হেনস্থা হয় তার জন্য শোক করতে বসবেন – বুঝতে না পেরে সগড়ী হাত উঁচু করে বাঁহাতে ছেলের মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে হাত বোলাতে থাকেন। ভাইবোনগুলো খাওয়া ভুলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

ঘটনার পারস্পর্য্য মা বুঝতে পারে। ছেলের চোখের জল মোছাতে মোছাতে মা শিউরে ওঠে, গলুকে কেউ কোন দিন এভাবে নিয়ে যাবেনা তো ? তারপর তিনটে ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "এসব কথা কাউকে বোলোনা বাবা। ওরা ভাল থাক। বেঁচে থাক। মার চোখে জল ঝরতে থাকে। গলু কিছুই বুঝতে পারে না; কিন্তু মায়ের চোখের জলও দেখতে পারেনা। তাড়াতাড়ি মায়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, "আমি কোথাও যাব না মা।"

হঠাৎ ঘরের বাইরে নিতাই-এর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল 'গলু গলু' বলে ছুটতে ছুটতে ও ওদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। মনে হচ্ছিল কোন বিশেষ খবর দেবার জন্যই ও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিল। কিন্তু এরকম কান্না ভেজা থমথমে পরিস্থিতি দেখে নিতাই কিরকম হঠাৎ ব্রেক কষা ট্রেনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

গলুর মা চোখ মুছে নিতাই কে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে নিতাই? কিছু বলবি?"(ক্রমশঃ)

পাঠকের কলম

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে - চিকিৎসার না কি কসাইখানা ?

–পূর্ণিমা নস্কর

আমার পরিচয় আমি দিতে চাইনা। ধরে নিন আমি কোন ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিক। বেসরকারী হাসপাতালে কাজ করি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নার্সিং-এর সার্টিফিকেট নিয়ে। দেখতে হয় অনেক কিছু, করতেও হয় অনেক কিছু। বিবেক কাঁদে তাও করতে হয় পয়সার জন্য। বিবেকের সেই দংশন মেটানোর জন্যই এই প্রতিবেদন।

বড়ো খারাপ লেগেছিল সেদিন - যখন রতনবাবু বলে এক ভদ্রলোক severe cardiac arrest নিয়ে এসে ভর্ত্তি হলেন, সরকারী হাসপাতালগুলোতে জায়গা না পেয়ে আমাদের এই ঝাঁ-চকচকে বেসরকারী হাসপাতালে। তাঁকে এবং তার পরিবার পরিজনকে দেখেই বুঝেছিলাম অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি তাঁরা, হাঙ্গরের খাঁই মেটানোর সাধ্য কোথায় ? তার চেয়েও বড়ো আঘাত পেলাম যখন জানলাম তাঁর বাইপাস সার্জারী ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। Heart-lung mechine-এ রেখে operation করা হ'ল এবং OT table-এই উনি মারা গেলেন। তথাপি বাড়ির লোক জানল তাঁকে ICCU তে রাখা হয়েছে, Stable হলে General bed-এ দেওয়া হবে। ওনার অসহায় অবিবাহিত মেয়ে, সংসারের ভারে নুব্জ হয়ে যাওয়া ছেলে আসত দেখতে রোজ। ICCU-র কাঁচের ঘরের বাইরে থেকে machine-এর হাপরের মতো ওঠানামা, তাদের বাবার বেঁচে ওঠার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জানান দিত। আর সেই মিথ্যে আশ্বাস তারা রোজ বাড়ী গিয়ে জানাতো তাদের উপোসী মাকে। আরও দুদিন পরে তারা জানল তাদের বাবা নেই। বিল হয়েছে প্রায় তিন লাখ। ভর্ত্তির পর থেকে খেপে খেপে হাজার পঞ্চাশের মতো তারা জোগাড় করে দিয়েছিল। মৃতদেহ পাবেনা বাকী টাকা না দিলে।

আমি খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি। এরপর আরও রতনবাবু-দের দেখেছি। এখন ভাবি রতনবাবুরা কি জন্য এই পৃথিবীতে আসেন ? হাঙ্গরদের খাঁই মেটানোর জন্য ? বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় Multidispentionary হাসপাতালে ছেয়ে গেছে। তবু সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পায়না। প্রবঞ্চিত হয়। চিকিৎসা পায় তারাই যারা উচ্চমূল্যে তা ক্রয় করতে পারে - সেই কতিপয় মানুষই। এই মিথ্যা উন্নতির কি দাম আছে, বলতে পারেন ?

প্রথম বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖নভেম্বর ২০১১

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

‘আন্তর্জাতিক রসায়নবর্ষ ২০১১’ কোন দৃষ্টিতে পালন করা উচিত

বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারের মধ্যে এক একটি আবিষ্কার, মানব সভ্যতার নিরিখে যুগান্তকারী – যা মানুষের জীবন যাত্রায় অভিযোজন ঘটিয়েছে। প্রাচীন যুগে আগুণের আবিষ্কার ও আধুনিক যুগে বিদ্যুতের আবিষ্কার এ রকমই দুটি মাইল-ফলক। বিদ্যুৎ এক প্রকারের শক্তি। আধুনিক সভ্যতার চালিকাশক্তি হল বিদ্যুৎ। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মাইকেল ফ্যারাডে, হাইগেন্স, ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানী এক দিকে শক্তির উৎস ও সঞ্চালন সম্পর্কিত তরঙ্গতত্ত্ব এবং অন্য দিকে বেকারেল, মাদাম ক্যুরি, পিয়ারে ক্যুরি, এনরিকো ফার্মি, প্রমুখ বিজ্ঞানীর দ্বারা তেজষ্ক্রীয় পদার্থ আবিষ্কারের কালে, পরমাণুর পর্যায় ক্রমিক উন্নত থেকে উন্নততর গঠন কাঠামোর আবিষ্কার পরমাণু সংক্রান্ত পূর্বতন অসামাধিত প্রশ্নের সমাধান ঘটিয়েছে যেমন, তেমনই আবার হাজির হয়েছে অনেক নতুন প্রশ্ন। থমসন, রাদারফোর্ড, নিলস্ বোর, সামারফিল্ড, পাঠলি, হাইজেনবার্গ এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জানা যায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি স্তরে, বিভিন্ন শক্তি ধারণ করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি উচ্চশক্তিস্তর থেকে নিম্নশক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হবার সময় শক্তির মুক্তি ঘটে। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব $\left[E = h\upsilon\right]$ এবং আইনস্টাইনের ভরশক্তির সমন্বয় সূত্র $\left[E = mc^2\right]$ ও ফোটো ইলেক্ট্রিসিটি-এর তাত্বিক ব্যাখ্যা, (যে কারণে ১৯২০ সালে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান) আইরিন ক্যুরি ও ফেডারিক জোলিও এর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার পরিষ্কার করে দেয় – পরমাণু নিজেই বিপুল শক্তির অধিকারী। শুরু হয় পরমাণু থেকে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা। আবিষ্কৃত হয় নিউক্লিয়ার সংযোজন, নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়া, কৃত্রিমভাবে তেজষ্ক্রীয় মৌল গঠন ও বিপুল শক্তির উদ্ভাবন।

বিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক অভূতপূর্ব আবিষ্কারগুলি যখন ঘটছে, তখন চলছে বিশ্ব বাজারের দখলদারি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিরোধ। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে ঘটে যায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর বিশ্বযুদ্ধ দুটিতে বিজ্ঞানীরা ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।

রসায়ন শাস্ত্রের চাবিকাঠি হল মেন্ডেলিফ আবিষ্কৃত পর্যায় সারণী। কিন্তু মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র ও পর্যায় সারণীর প্রাথমিক ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল মোজলের আবিষ্কৃত পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক দ্বারা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে – মোজলে, বৃটিশ আর্মিতে, টেলিফোন যোগাযোগের জন্য টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্ত হন এবং মাত্র ২৭ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে, বৃটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করে – যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনও বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করা হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, হিটলারের ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করার কারণে, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ত্যাগ করতে হয়।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর দ্বিতীয় পুত্র অরউইন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির যোগ দেওয়ার বিরোধিতা করায় ১৯৪৫-এর ২৩শে জানুয়ারী, বার্লিনের এক জেলখানায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

ম্যানহাটন প্রোজেক্টে – বহু বিজ্ঞানী বাধ্য হন যুক্ত হতে। তাদের মধ্যে ক্লাউস ফুক্স, ওপেন হাইমার, নিল্স বোর, এনরিকো ফার্মি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফ্রেডরিক জোলিও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে শ্রমিকশ্রেণীর

● *শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন*

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com